দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

অতল যাহার দেশপ্রেম
তিনিই অটলবিহারী
— পৃঃ ২৪

ধারা ৩৭০ ছিল
ভারতের সঙ্গে ভয়াবহ
বিশ্বাসঘাতকতা
— পৃঃ ১৬

৭৬ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩।। ৮ পৌষ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

বহুমুখী প্রতিভায় অবিস্মরণীয়

অটলবিহারী বাজপেয়ী

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ৮ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৫ ডিসেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

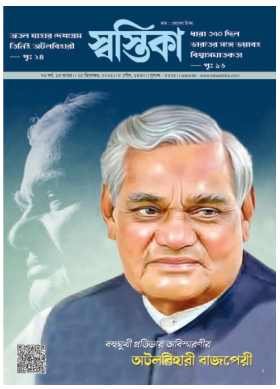

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'মমতার হালছাড়া রাজ্য আর মাস্তুলভাঙা ইন্ডিজোট' অন্ধকে অন্ধ পথ দেখালে... □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

পিসি প্রধান আর ভাইপো মুখ্য, আহা আহা আহা □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

'বিষ্ণু-মোহন-ভজন' সামনে নতুন নেতৃত্ব □ আর. জগন্নাথন □ ৮

ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল দাউদ □ বিশ্বামিত্র □ ১০

জম্মু-কাশ্মীরের নবজীবন প্রাপ্তি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠবে □ সুজিত রায় □ ১১

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ : আর্থিক প্রভাব কতটা? □ সুদীপ্ত গুহ □ ১৩

ধারা ৩৭০ ছিল ভারতের সঙ্গে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা □ মন্দার গোস্বামী □ ১৬

ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও জামিয়া মিলিয়ার যোগ প্রমাণিত □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১৮

অটলবিহারীর অবদান চিরন্তন ও অটল □ শেখর সেনগুপ্ত □ ২৩

অতল যাহার দেশপ্রেম, তিনিই অটলবিহারী □ শিলাদিত্য ঘোষ □ ২৪

বাজপেয়ী ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ □ অমিত কুমার চৌধুরী □ ২৮

দেশপ্রেমিক কবি অটলবিহারী □ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৯

ব্রহ্মবিহারী অটলবিহারী কবিতায় ও ডাকটিকিটে □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩০

সন্তকথা : রামদাস কাঠিয়াবাবা □ কল্যাণ গৌতম □ ৩১

তুলসীপূজন অর্বাচীনকৃত্য নয়, হাজার বছরের ধর্মীয় উত্তরাধিকার □ শীর্ষ আচার্য □ ৩৪

শিষ্য সামীপ্যে গীতাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ □ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী □ আনন্দ মোহন দাস □ ৪৩

বালুরঘাট থেকে আজিমগঞ্জ যাত্রীসাধারণের দাবি মুর্শিদাবাদ-শিয়ালদা পর্যন্ত ট্রেন চাই □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৪৫

রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ভারতীয় ইতিহাসকে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছে □ পিন্টু সান্যাল □ ৪৬

ভদ্রতার আড়ালে নগ্নচরিত্র □ শেফালি সরকার □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩৭-৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

প্রকাশিত হবে ১ জানুয়ারি, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১ জানুয়ারি, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু

খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিতে একদিকে যেমন কিছু মানুষ উদ্দামতার সঙ্গে হইহুল্লোড় করে নিউ ইয়ার পালনে মেতে ওঠেন, অন্যদিকে সনাতনী বাঙ্গালিরা মেতে ওঠেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মননে দিনটিকে 'কল্পতরু দিবস' হিসেবে অতিবাহিত করতে। এই দিনটিতে ঠাকুর কল্পতরু হয়ে ভক্তদের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতিকে বার্তা দিয়েছিলেন— তোমাদের চৈতন্য হোক।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কল্পতরু দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবেন— ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, স্বামী আত্মবোধানন্দ, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নূতন ভারতের পথপ্রদর্শক

ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে অটলবিহারী এক অবিস্মরণীয় নাম। পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। তিনি দেশ ও বিদেশে এক সম্মাননীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। বিপক্ষীয়দের নিকটও তিনি বাস্তববাদী রাজনীতিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। চার দশকেরও অধিক সময়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি রাষ্ট্রভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার রাষ্ট্রভক্তির পরিচয় পাইয়াছে সমগ্র দেশ। বিরোধী নেতা হিসাবে বিদেশের মাটিতেও তিনি দেশের স্বার্থ সর্বাগ্রে দেখিয়াছেন। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিশ্বনেতা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন, শুধু ভারতবাসী নহে, প্রবাসী ভারতীয়দেরও তিনি আশা-ভরসার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি ঘটিতেছে। চতুর্দিকে তাহার নামে জয়ধ্বনি উঠিতেছে। কিন্তু তিনি যাঁহার হাত ধরিয়া সংসদীয় রাজনীতিতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেইরূপ বলিতেছেন, 'ভারত সর্বাগ্রে', তদ্রূপ অটলবিহারী বাজপেয়ীও বলিতেন, তাঁহার ভালো লাগার প্রথমটি হইতেছে তাঁহার দেশ 'ভারত'। স্বভাবকবি অটলজীর কবিতার ছত্রে ছত্রে ভারতমাতার প্রতি অঙ্গীকার ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি দেশভক্তির প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায়। রাজনীতিতে আসিবার পূর্বে তিনি সঙ্ঘ প্রচারকের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সঙ্ঘ যোজনায় তাঁহার রাজনীতিতে পদার্পণ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যোগ্য উত্তরসূরী রূপে দলকে পরিচালনা করিয়াছেন তিনি। বিদ্যার্থী জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তিনি কারাবরণও করিয়াছেন।

দেশের উন্নয়নকল্পে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর যাহা যাহা পদক্ষেপ, তাহার পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহ অটলবিহারী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশের উন্নয়ন, দরিদ্র মানুষের কল্যাণ এবং সুশাসনকল্পে নূতন যুগের তিনিই স্রষ্টা। তিনিই প্রথম অনুধাবন করিয়াছিলেন দেশের বিকাশে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে দেশের রাস্তাঘাট। তাঁহার স্বর্ণ চতুর্ভুজ কলকাতা-চেন্নাই-দিল্লি-মুম্বইকে একসূত্রে গাঁথিবার পরিকল্পনা ও রূপায়ণ দেশের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। তাঁহার 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনা' গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাকে এক অন্য মাত্রা দিয়াছে। মাতৃশক্তির ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সাম্যের প্রবক্তা তিনিই। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রনেতা যিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে দেশীয় ভাষা হিন্দিতে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেশকে পরমাণু শক্তিধর করিবার কৃতিত্বও তাঁহারই। তিনি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ' স্লোগানে যুক্ত করিলেন 'জয় বিজ্ঞান'। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করা, অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণ তাঁহার স্বপ্ন ছিল। বর্তমানে তাঁহার সেই স্বপ্ন বাস্তব হইয়াছে। তিনিই কাশ্মীরের জন্য মানবতা, গণতন্ত্র ও কাশ্মীরি সংস্কৃতি রক্ষার কথা বলিয়াছিলেন।

পূর্ণরূপে তিনি মূল্যবোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখিতেন। ১৯৭১ সালে বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন করিবার সময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, দেশের সংকট মুহূর্তে বিরোধী পক্ষ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, সকলকেই সরকার পক্ষ হইয়া প্রধানমন্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইবে। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক বিরোধীরা সরকারের বিরোধিতা করিতে করিতে রাষ্ট্র বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের অটলজীর জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। মূল্যবোধের রাজনীতিতে তিনি কত বিশ্বাস রাখিতেন তাহার একটি উদাহরণ হইল, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একবার তাহার নিকট রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর জন্য পরামর্শ আসিয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং তাহা ভবিষ্যৎ নেতৃবর্গের জন্য একটি বিপজ্জনক উদাহরণ সৃষ্টি করিবে। তিনি তৎক্ষণাৎ ড. এপিজে আবদুল কালামের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এহেন বাস্তববোধসম্পন্ন রাজনীতিক অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁহার স্বল্পমেয়াদের শাসনকালেও দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক হইয়া দেশকে অগ্রগতির পথ দেখাইয়াছেন। দেশ যে আজ চার ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অতিক্রম করিয়াছে, তাহারও পথ প্রদর্শক তিনিই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বে শ্রেষ্ঠ জননেতা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছেন, ইহা খুবই গর্বের বিষয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, অটলবিহারী না থাকিলে নরেন্দ্র মোদী সৃষ্টি হইতেন না। অদ্যকার নূতন ভারতের রূপায়ণে সর্বত্রই অটলজীর ছায়া রহিয়াছে। তাঁহার জন্মদিনে সমগ্র দেশ তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে।

সুভাষিতম্

সদয়ং হৃদয়ং যস্য ভাষিতং সত্যভূষিতম্।

কায়ঃ পরহিতে যস্য কলিস্তস্য করোতি কিম্ ।

যার মন দয়ায় পরিপূর্ণ, যার কথাতে শুধুই সত্য, যার শরীর পরোপকারের জন্য, কলি তার কী ক্ষতি করবে?

‘মমতার হালছাড়া রাজ্য আর মাস্তুল ভাঙা ইন্ডিজোট’ অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তিন রাজ্যের ভোটে বিজেপির সাফল্যে বিচলিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ঘোড়ায় হাসবে এমন দাবি করছেন— পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে ‘ইন্ডি জোটকে’ পথ দেখাবে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। ‘উলটো রাম’ বোঝা কিছু অজ্ঞান ব্যক্তি তা নিয়ে অনধিকার চর্চা শুরু করেছে। দু’জনেই এক সারণিতে। তাদের দাবি ব্রিগেডে কেবল রাজনৈতিক সম্মেলন হবে। দেশ বিরোধী কয়েক গাছা ইতিহাসবিদ নাকি তা ঠিক করেছেন। ফলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে আচার্য শঙ্কর, মাধ্বাচার্য, রামানুজাচার্যের গীতার ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের যারা কিছুই পড়েননি বা বোঝেননি তারা ঋষি বঙ্কিম, শ্রীঅরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক আর স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে চচ্চড়ি বানাচ্ছেন। অবান্তর কিছু সাহেবি ব্যাখ্যাকেও ব্যবহার করছেন। অবোধরা হয়তো বোঝেননি বিষয়টি গীতাপাঠ।

ব্যাখ্যা, ভাষ্য বা টীকা পাঠ নয়। আর ব্রিগেডে তা করা যাবে না এরকম কোনো সরকারি নির্দেশ নেই। মমতা রাজ্যে এই ধরনের অন্ধদের উদয় অস্বাভাবিক নয়। ‘ইফ এ ব্লাইন্ড লিডস এ ব্লাইন্ড বোথ ফল ইনটু ডিচ’— অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে দু’জনেই খন্দে পড়ে। ১৮৯৩ সালে বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ ঋষি অরবিন্দ তাঁর প্রথম লেখায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের এই বলে আক্রমণ করেছিলেন। সে সময়ের কংগ্রেস নেতাদের তিনি সঠিকভাবেই ব্রিটিশ চাটুকার বলে মনে করতেন। ভারতের ‘পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা’ আর ব্রিটিশের ‘ভারত ছাড়ো’-র দাবি তিনি প্রথম তোলেন মুম্বই থেকে প্রকাশিত ‘ইন্দুপ্রকাশ’ পত্রিকার লেখার ভিতর দিয়ে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন আর ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে ওই দাবি মানা হয়। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়। ওই কাগজে শ্রীঅরবিন্দের ন’টি আগুন ঝরানো লেখা কংগ্রেস নেতা আর ব্রিটিশরা জোর করে বন্ধ করে দেয়।

১৯০৬ সালে ইংরেজি ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি ওই নিষেধাজ্ঞা ভাঙেন। বঙ্গ আর বাঙ্গালির এই ইতিহাসকে নতুন করে জানার প্রয়োজন পড়েছে। বিগত বারো বছর ধরে এই রাজ্যে শাসকের যে চুরি, অন্যায় আর অত্যাচার চলেছে তা নজরে রেখে বঙ্গের পুনর্জাগরণের সময় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও-এর প্রয়োজন পড়েছে। আর তা না হলে আমরা সকলে অপরাধী থেকে যাব। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকে পুনর্জাগরণের সেই টীকা লাগাতে হবে। পাঁচ রাজ্যের ভোটের পর বিজেপির সাফল্যের প্রভাব এ রাজ্যেও পড়তে বাধ্য। রাজ্য বিজেপি তার কতটা উশুল করবে সেটাই দেখার।

> **পাঁচ রাজ্যের ভোটের পর বিজেপির সাফল্যের প্রভাব এ রাজ্যেও পড়তে বাধ্য। রাজ্য বিজেপি তার কতটা উশুল করবে সেটাই দেখার।**

দুর্নীতির ঢেউয়ে মমতার নৌকার হাল ভেঙেছে আর বিজেপি ঝড়ে ইন্ডিজোটের মাস্তুল পড়েছে। রাজ্য বিজেপির সামনে মমতার পাশাকে উলটে দেওয়ার সুযোগ এসেছে। এবারের লোকসভা ভোট এক আদর্শ দেশ গঠনের ভোট। বহুর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার অন্যতম কাণ্ডারি। তাই বিজেপির কাছে এই রাজ্যে তৃণমূলকে টলানো না গেলে রাজ্য আর দেশের সামগ্রিক ক্ষতি। নরেন্দ্র মোদীর কাছে ২০২৪-এর ভারত জয় যতটা সহজ আর সাবলীল, মমতার বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপির লড়াই তার অনেকটাই কাছাকাছি। ২০১১ সালের পর মমতা আর রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। অনেকের দাবি তিনি ‘আমলা দাসী’। দলের নেতা এমনকী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও তিনি শোনেননি।

কিছু পুলিশ আর প্রশাসনিক আমলা তাঁকে চালান। একজনকে তিনি সিবিআই থেকে বাঁচিয়েছিলেন। একজনের নির্দেশে এক শিল্পগোষ্ঠী ৩০০ কোটি টাকা তার দলে ঢেলেছিল। শুনেছি অভিষেক চলেন আই-প্যাকের কথায়। মমতা আমলাদের। তুই বেড়াল না মুই বেড়াল। মমতার শিরে সংক্রান্তি। শুনছি তার আরও কিছু ঘনিষ্ঠ চুরির দায়ে শীঘ্র ধরা পড়বে। অনেকের দাবি তৃণমূল চোরের দল বলে দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অন্য রাজ্যগুলি নাম দিয়েছে ‘দিদিকী ঘোটালা সরকার’। মমতা ভালো জানেন তাঁর হাল-মাস্তুল খুলে গিয়েছে। কিছুদিনের ভিতর হয়তো ‘আম-ছালা’ও চলে যাবে। কয়েক বছর ধরে এ রাজ্যে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। এবার তাদের খন্দে পড়ার সময় উপস্থিত।

(মতামত ব্যক্তিগত)

পিসি প্রধান আর ভাইপো মুখ্য আহা, আহা, আহা

স্বপ্নদ্রষ্টাযু দিদি,

এই চিঠি যখন লিখতে বসেছি তখন আপনি দিল্লিতে। সঙ্গে ভাইপো। আর এদিকে আপনার দলের 'জেলখাটা' বিবেক নানা বাণী দিয়ে চলেছেন। এই কুণাল ঘোষ নামক বিবেকটিকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। উনি কার লোক, কেন লোক কিছুই বোঝা যায় না। গিরগিটিসুলভ আচরণে কখনও বলে দেন আপনার বিরুদ্ধে। কারণ, আপনি ওঁকে জেলের ঘানি টানিয়েছিলেন। এখন আবার 'ভাগ্গা' আদরে দলে রেখেছেন। কেউ কেউ বলে, আসলে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, ও অনেক কিছুই জানে। তার উপরে আবার উনি ভাইপোর মুখ। ভাইপো মনে মনে যা ভাবেন, কানে কানে বলেন, সেটাই সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন কুণাল।

আপনি যখন প্রবীণদের তোল্লা দিতে সভা করেন তখন ভাইপো গোঁসাঘরে বসেছিলেন। আর তার পরে কেন ভাইপোর ছবি ছাড়াই পিসি সভা করে ফেললেন তা নিয়ে মুখর হন তিনি। তার পরের দিনেই তিনি আবার বলে বসেন, কী বলেছি ভুলে গিয়েছি। ওঁর কথার কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য বোঝা দায়।

তবে দিদি সম্প্রতি উনি যেটা বলেছেন সেটা কিন্তু আমি মানতে পারিনি। বলেছিলেন, ২০৩৬ সালের পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ ২০৩৬ সাল পর্যন্ত আপনিই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। তার পরে অভিষেক হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতার উত্তরসূরি। এটা বলার পরেই আমার খারাপ লেগেছিল। হতে পারে 'দিবাস্বপ্ন' কিংবা স্বপ্নের পোলাওয়ে মণ মণ ঘি ঢালা, তবু আমি তো আপনার 'অনুগত' ভাই হিসেবে আপনাকেই বিশ্বাস করেছি। আপনি যেমন বলেন তেমন করেই ভেবেছি আর কয়েক মাস পরেই মোদী জমানায় শেষ আর আপনি দেশের প্রথম বাঙ্গালি মুখ্যমন্ত্রী।

কুণাল আপনাকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রাখতে চেয়েছিল। কারণ, ওঁর মনে হয়েছিল মুখের কথা জ্যোতি বসুর রেকর্ডটা আপনি ভেঙে দিন। বসু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন টানা ২৩ বছর। আপনি ২০৩৬ পর্যন্ত থাকলে ২৫ বছর হয়ে যাবে। কিন্তু দিদি, এর আগেই যে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে। পায়ের ব্যথা সারিয়ে দিল্লির চেয়ারে গিয়ে বসতে হবে!

এই স্বপ্নে ধাক্কা দিয়ে দিলেন কুণাল। আমি মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আপনিও নিশ্চয়। মনে হয় আড়ালে কানু মুলে দিয়েছেন কিংবা ফোনে গাল দিয়েছেন। এরপরে কুণাল বয়ান বদলেছেন। বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৩৬ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। তার পরে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব- আলোচনার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু এর মাঝে যদি দেশের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের সুযোগ মমতাদির সামনে চলে আসে, তা হলে তা তিনি গ্রহণ করবেন না কেন? সেই সন্ধিক্ষণে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক।'

আহা আহা আহা। কী সুন্দর। একই সঙ্গে পিসি প্রধানমন্ত্রী এবং ভাইপো মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ব রেকর্ড। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। লিমকা বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস সব জায়গায় নাম উঠে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে ৪২ আসনে ৪২ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী। না, না এখানে বিজেপি কিছুই পারে না। সব আপনি। সঅঅঅঅঅব। কিন্তু তাতেও ২০০-র বেশি আসন চাই। সে সব জোটসঙ্গীরা তুলে নেবেন। কী করে নেবেন আমি জানি না।

তবে চিন্তা একটাই দিদি। এখন থেকেই আপনার উত্তরসুরি খোঁজা শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই ধরেই নিয়েছে আর আপনাকে দিয়ে চলবে না। এটা খুব বাজে সংকেত।

কুণাল আরও বলেছেন যে, আপনাকেই 'ইন্ডিয়া' নামক জোটের মুখ করা উচিত। কারণ, ভাইয়েরা জেলে থাকলেও আপনিই গোটা দেশে সততার মুখ। আপনি নিজে বিশ্বাস না করলেও আমি করি। কিন্তু বাকি দলগুলো মেনে নেবে তো? আপনি অবশ্য নিজে মুখে বলছেন, মুখ আবার কী? সব কিছু ভোটের পরে দেখা যাবে। আপনি কিন্তু এই ব্যাপারে সঠিক বলেছেন। আপনি আমার মতো দিবাস্বপ্ন না দেখে আগে ভোটের ফল দেখতে চান। জিতলে এক রকম আর না জিতলে আর এক রকম। আপনি তো আর মোদী বা বিজেপি নন যে আগে পরে একই কথা বলতে হবে!

তবে চিন্তা একটাই দিদি। এখন থেকেই আপনার উত্তরসুরি খোঁজা শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই ধরেই নিয়েছে আর আপনাকে দিয়ে চলবে না। এটা খুব বাজে সংকেত। দেশের সব আঞ্চলিক দলেই এই ভাবে পূর্বসূরিদের গদি থেকে সরিয়ে ছেলে-মেয়েদের উত্তরসূরি হতে দেখা গিয়েছে। আপনার কথায় পরিবার না থাকলেও ভাইপো লোভী চোখে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে। চোখ, কান খোলা রাখবেন দিদি। □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

‘বিষ্ণু-মোহন-ভজন’ সামনে নতুন নেতৃত্ব

বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাম্প্রতিক আচার-আচরণ কিছুটা রহস্যময়। উদাহরণ ১ : ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী পদে যথাক্রমে বিষ্ণুদেও সাই, মোহন যাদব ও ভজনলাল শর্মার অপ্রত্যাশিত মনোনয়ন। সাধারণ জনতা এবং সবরকমের খবরাখবর সংগ্রহকারী সংবাদমাধ্যমের কাছে উপরোক্ত নামগুলি যেন আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক নির্বাচন।

যদিও আকস্মিক নয় : উপরোক্ত তিন ব্যক্তি আকস্মিকভাবে নির্বাচিত নন। এই নির্বাচনের পেছনে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি। ২০০১ সালে কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে কেশুভাই প্যাটেলের একাধিক উত্তরসূরির নাম জল্পনায় ভাসলেও নরেন্দ্র মোদীর মতো একদা সঙ্ঘ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, প্রতিভাবান কার্যকর্তা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদের পক্ষে উপযুক্ত মুখ হয়ে উঠবেন? আজ নরেন্দ্র মোদী ছাড়া বিজেপি-র অস্তিত্ব যেন কল্পনাতীত! দু’টি মেয়াদে মনোহরলাল খট্টর এবং ২০০৩-’০৫ সালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে উমা ভারতী ও বাবুলাল গৌড়ের অতি স্বল্প মেয়াদের পর শিবরাজ সিংহ চৌহানের নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে।

বয়সটাই শেষ কথা নয় : ছত্তিশগড়ে বিষ্ণুদেও সাই, মধ্যপ্রদেশের মোহন যাদব বা রাজস্থানের ভজনলাল শর্মার মধ্যে শেষোক্ত দু’ জনের বৈশিষ্ট্যটি অনুরূপ। একাধিক পোড় খাওয়া, পরীক্ষিত ও জনপ্রিয় নেতৃবর্গকে টপকে এই দুই জনের নির্বাচন প্রমাণ করে যে বয়সটা এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনো ফ্যাক্টর নয়। সংবাদমাধ্যমে প্রচার যে নবীন প্রজন্মের নেতৃত্ব অন্বেষণেই নাকি এমন সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাস্তবে— কিঞ্চিৎ প্রবীণ শিবরাজ সিংহ চৌহানের বয়স বর্তমানে ৬৪। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ৫৮ বছর বয়সি মোহন যাদব উজ্জয়িনী (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনবারের নির্বাচিত বিধায়ক। ২০০৫ সালে শিবরাজ সিংহ চৌহান যখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন তখন তাঁর বিধায়ক পদের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। সেই অর্থে মোহন যাদব ২০০৫-এর শিবরাজ সিংহ চৌহানের তুলনায় বর্তমানে পরিষদীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতার নিরিখে ১২ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ২০১৪ সালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করা কালীন মনোহর নান খট্টরের বয়স ছিল ৬০।

রাজস্থানের ক্ষেত্রে কি কঠিন সিদ্ধান্ত?

রাজস্থানে ব্যাপকতর সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার দরুন ৭০ বছর বয়সি বসুন্ধরা রাজের দাবিকে উপেক্ষা করে বিকল্প নেতৃত্বের অনুসন্ধান ছিল দলের কাছে একটি কঠিন বিষয়। এই কারণে বিজেপিতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে— এটি একটি আংশিক সত্য। নেতৃত্ব চয়নের ক্ষেত্রে বিজেপির এজাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে মূলত চার ধরনের যুক্তি ও চিন্তাধারা ক্রিয়াশীল।

(১) বলিষ্ঠ জাতীয় নেতৃত্ব : প্রথমত, শক্তিশালী ও যোগ্য জাতীয় নেতৃত্বের উপস্থিতির দরুন রাজ্য নেতৃত্ব সমূহকে স্বাভাবিক নিয়মেই হতে হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুসারী। দলীয় ক্ষমতাকেন্দ্র দ্বারা গৃহীত মত ও পথের বিরোধিতা সেই ক্ষেত্রে কাম্য নয়।

(২) পরীক্ষানিরীক্ষা : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অন্বেষণ, উদীয়মান রাজনৈতিক প্রতিভাদের তুলে আনার মতো পরীক্ষানিরীক্ষার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। যদিও এই পরীক্ষার সাফল্য অনিশ্চিত। রাজনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠি এই ক্ষেত্রে তিনটি— নতুন নেতৃত্বকে একাধারে হয়ে উঠতে হবে দক্ষ প্রশাসক, সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী এবং অসাধারণ রাজনৈতিক নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ। এরূপ ত্রিগুণান্বিত বা ত্রিশক্তির আধার সম্পন্ন ব্যক্তি সত্যিই বিরল।

(৩) নেতৃত্বদানের শক্তি : শাসনক্ষমতা দীর্ঘদিন করায়ত্ত থাকার দরুন প্রশাসন বা সরকার পরিচালনা ও মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শক্তির অধিকারী ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের এই শক্তির বিপ্রতীপে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতারোহণ পর্বে বিজেপি নেতৃত্বে ছিল সেই প্রকারের গভীরতার অভাব। এই কারণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে দলে ও সরকারে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের বিকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল।

(৪) নির্বাচনী অঙ্ক : নির্বাচনী পরিসংখ্যানের আঙ্গিকে হিন্দুদের একজোট করার মতো মজবুত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বিজেপি-র লক্ষ্য হিন্দুদের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত ঐক্য বিধান। বিভিন্ন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক জীবনে উন্নতির অঙ্গ হিসেবে দলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রূপে বিবেচনা করলে এহেন ঐক্য সাধন সম্ভব।

সামাজিক প্রকৌশল বা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ২.০ : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর সঙ্গে শপথ নেওয়া দু’জন উপমুখ্যমন্ত্রী— অরুণ সাউ ও বিজয় শর্মা যথাক্রমে অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি) ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সেই রাজ্যের দুই উপমুখ্যমন্ত্রী— রাজেন্দ্র শুক্লা ও জগদীশ দেওড়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও তপশিলি জাতিভুক্ত। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে মোহন যাদবের নির্বাচন পড়শি রাজ্য উত্তরপ্রদেশের যাদব সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রতি একটি সদর্থক বার্তা হতে পারে। কারণ, ওই রাজ্যে বিজেপি এখনও যাদব সম্প্রদায়ের বড়ো অংশের সমর্থন থেকে বঞ্চিত। রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী

নরেন্দ্র সিংহ তোমর হতে চলেছেন মধ্যপ্রদেশের স্পিকার। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁর দুই উপমুখ্যমন্ত্রী--- দিয়া কুমারী ও প্রেমচাঁদ বৈরওয়া যথাক্রমে রাজপুত ও দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত।

সম্প্রদায়গত সমীকরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্যগত এহেন বিন্যাসটি বিজেপি-র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য না হলেও, দেশের 'মণ্ডলী'করণের পরবর্তী অধ্যায়ে রাজনৈতিক পরিসরে সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিঙের এই সফল প্রয়োগকারীদের মধ্যে বিজেপি কিন্তু অগ্রগণ্য।

পাদপ্রদীপের আলোয় না থাকা রাজনৈতিক প্রতিভা : যদিও বিজেপি একটি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দল। প্রশাসনিক দায়িত্ব ও দলীয় সংগঠন পরিচালনায় মুনশিয়ানার অধিকারী বহু রাজনৈতিক প্রতিভাবানদের এক সঙ্গমস্থল হলো বিজেপি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের উন্মেষের উৎস প্রধানত তিনটি : (১) নিজস্ব ঘরানার লোকজন, (২) বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্তি, (৩) আমলাতন্ত্র বা কর্পোরেট ক্ষেত্র থেকে নবাগত, একদা অরাজনৈতিক চরিত্র। বিজেপি-র ক্ষেত্রে এর অতিরিক্ত একটি উৎস হলো— সঙ্ঘের বিবিধ সংগঠন।

সঙ্ঘযোগ : বর্তমানে বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনৈতিক যোগ্যতার নিরিখে এই পদের দাবিদারদের বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করা যাক। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর লোকসভা আসনে ৫ বারের জয়ী সাংসদ যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরাসরি যোগ না থাকলেও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি দলীয় সংগঠন ও সঙ্ঘ— উভয় ক্ষেত্রেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কংগ্রেস থেকে আগত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা আজ হয়ে উঠেছেন দল ও সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের নয়নের মণি। মনোহরলাল খট্টর, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং অন্যান্য শীর্ষ রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্ঘযোগ রয়েছে।

অনুশাসিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দলীয় সেনানী : স্বচ্ছ ও সঠিক মানসিকতা, রাজনৈতিক সততা ও সঙ্ঘযোগসম্পন্ন এক ঝাঁক কার্যকর্তার সমাবেশ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজেপিকে একটি সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তাদের মধ্যে দেখা যায় সমর্পণের ভাব। অনুশাসনের দ্বারা তাঁরা হন শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই পদ্ধতিতে বিজেপিতে যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসে যাদের সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণিত। কোনো পদ না পেলেও এই ক্ষেত্রে তাদের তরফে দলত্যাগজনিত কোনো ঝুঁকি বা ক্ষতি নেই। রাজনৈতিক পদে আসীন হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে কেউ যদি কোনোভাবে ব্যর্থ হন এবং দলত্যাগ করেন, তবে তারা বিরোধী দলে যোগ না দিয়ে সঙ্ঘের দায়িত্বে পুনরায় ফিরে যান। এই বিষয়গুলির কারণে অন্যান্য দল অপেক্ষা বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে থাকে। রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়ের ৩ জন নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করেন যে অধিক পরিচিত মুখের পরিবর্তে দল একদা সঙ্ঘের দক্ষ কার্যকর্তাদের দায়িত্বদানের নীতিতে আস্থা রাখে।

কিছু রাজনৈতিক ঝুঁকি : বসুন্ধরা রাজে বা শিবরাজ সিংহ চৌহান দলবিরোধী হয়ে উঠবেন কী না— এহেন অনুমান সত্যে পরিণত হওয়ার হয়তো এটাই উপযুক্ত সময়! দুই বানপ্রস্থী নেতা-নেত্রীর রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এর দরুন দল যদি কোনো রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিপুল জনপ্রিয়তা সেই ক্ষতিপূরণে সক্ষম বলে বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকা সম্পাদকীয় নির্দেশক)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার চাঁচলের পূর্বতন নগর কার্যবাহ হিরিন পোদ্দার গত ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের তিনি দীর্ঘদিন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা খাতড়া সঙ্ঘকাজের পুরোধাপুরুষ দানীমোহন চক্রবর্তী গত ১৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি শ্রীরামমন্দির মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে দু'বার কারাবরণ করেছিলেন।

* * *

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি সারদাপল্লীর স্বস্তিকা পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী তথা দীর্ঘদিনের পাঠক দীপক চক্রবর্তী গত ৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক অশোক কুমার সরকার গত ১৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তার ২ পুত্রই স্বয়ংসেবক।

* * *

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক পরমেশ্বরলাল মুসাদ্দি গত ১৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি দীর্ঘদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালদা জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন দাউদ

খবরের শিরোনামে আবার দাউদ ইব্রাহিম। দাউদকে কি সত্যিই বিষ খাওয়ানো হয়েছে? বিষ খেয়ে দাউদের কি মৃত্যু হয়েছে? সামাজিক মাধ্যম থেকে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমজুড়ে নানা খবর প্রকাশিত হচ্ছে। দাউদ-ঘনিষ্ঠ ছোটা শাকিল আবার এইসব জল্পনাকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই আবার জানিয়েছে, দাউদের নিরাপত্তা ভেদ করা কঠিন। যেহেতু আমেরিকার নজরে রয়েছে দাউদ, তাই তার বিশেষ খেয়াল রাখা হয়। সেই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢুকে দাউদের ক্ষতি করা এক প্রকার অসম্ভব বলেই দাবি করেছে আইএসআইয়ের গুপ্তচররা। সব মিলিয়ে দাউদের মৃত্যু ঘিরে রহস্য বাড়ছেই।

প্রসঙ্গত, ডি-কোম্পানির জন্য যে অর্থমূল্য ঘোষণা করা হয়েছে, তার শীর্ষে রয়েছে দাউদ। এই মাফিয়া ডনের মুল্য ভারতীয় মুদ্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। একই সঙ্গে ১৫ লক্ষ টাকা করে ধার্য রয়েছে দাউদের ভাই আনিস ইব্রাহিম ওরফে হাজি আনিস, জাভেদ প্যাটেল ওরফে জাভেদ চিকনা, শাকিল শেখ ওরফে ছোটা শাকিল এবং ইব্রাহিম মুস্তাক আবদুল রজ্জাক মেমন ওরফে টাইগার মেমন প্রমুখ কুখ্যাত অপরাধীদের জন্য।

পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা, ১৯৯৩ সালের মুম্বই সিরিয়াল বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূলচক্রী মাফিয়া ডন দাউদের 'মাথার দাম' অবশ্য আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য ট্রেজারি ২০০৩ সালে ধার্য করে ২৫ মিলিয়ন ডলার যা ভারতীয় মুদ্রায় ২০৭ কোটি টাকার বেশি। এইসব দাম ধার্য বিষয়টির মধ্যে অবশ্যই কিছু 'ধূসর ক্ষেত্র' রয়েছে। দাউদ কোথায় কীভাবে আছে, কাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তার কাজকর্ম পরিচালনা করছে তার কিছুই এখন আর গোপন নয়। ফলে দাউদের সন্ধান দেওয়াটা বা তাকে ভারতে প্রত্যার্পণ করার ব্যাপারটা এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়। ফলে এই মূল্য প্রাপ্তি বা পুরস্কার প্রদান দুই-ই আপাতত আলংকারিক ঘোষণাই হয়ে রয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

দাউদ ইব্রাহিমের অপরাধের তালিকা দীর্ঘ। তার মধ্যে অস্ত্র ও বিস্ফোরকের চোরা কারবার, ড্রাগ আমদানি থেকে শুরু করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানো, বিখ্যাত ব্যক্তিদের খুনের হুমকি দিয়ে টাকা আদায়, লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, আল কায়দা-সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সহায়তা করে যাওয়া, জালনোট ছড়িয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে আঘাত করার চেষ্টা সবই রয়েছে।

ভারত বিগত তিন দশক দাউদকে দেশে ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে দাউদ নিজে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে, তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার মিঁয়াদাদের ছেলের সঙ্গে। গত ৩০ বছর ধরে ভারতের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' অপরাধী দাউদ ইব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদও তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন 'মোস্ট সার্চড নিউজ'। তবে এই আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে থাবা বসালেও ভারতীয় ক্রিকেট দুনিয়ায় কিন্তু একবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

ঘটনাটি ১৯৮৬ সালের। দাউদ তখন ক্রিকেট মাঠের বেশ পরিচিত মুখ। মুম্বইয়ের ডোঙ্গরি থেকে উঠে আসা মামুলি এক ছেলের ডন হয়ে ওঠার মধ্যেও প্রকাশ্যে নিজেকে ক্রিকেট-প্রেমীরূপে তুলে ধরতে চাইছিল সে। দাউদ শুধু ক্রিকেটের নেশায় দুবাইয়ে শারজার মাঠে যেত না, তার লক্ষ্য ছিল ক্রিকেটারদের বেটিঙে জুড়ে ফেলা। আর তাই ক্রিকেটারদের দামি-দামি উপহার দিয়ে হাত করার চেষ্টা করতে সে। সে বছর ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাউকে না কাউকে বেটিং-চক্রে জুড়তে মরিয়া হয়ে উঠেছিল দাউদ। কিন্তু কপিল দেবের মতো ক্রিকেটারের জন্য সে লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

কপিল তখন ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন, ১৯৮৩ সালে ভারতকে বিশ্বকাপও জিতিয়েছেন। ভারত তো বটেই ক্রিকেট দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো তারকা হয়ে উঠেছেন কপিল তখন। তাঁরই সামনে পড়ে গিয়েছিল দাউদ। এই ঘটনা প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন ক্রিকেটার দিলীপ বেঙ্গসরকার। শারজার ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন প্র্যাক্টিস সেরে ড্রেসিংরুমে ফিরছিল ভারতীয় দল। ম্যাচের ঠিক আগের দিন ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়ে দাউদ। সঙ্গী ছিলেন এক নামি অভিনেতা। তিনি ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে দাউদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একজন ব্যবসায়ী রূপে। দাউদ পরিচয়-পর্বের পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যদি ফাইনালে ভারত জেতে, তা হলে ভারতীয় টিমের সব খেলোয়াড়কে সে দামি গাড়ি (টয়োটা করোলা) উপহার দেবে।

দাউদের ঘোষণা রীতিমতো চমকে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। এমন দামি উপহার যে কেউ দিতে পারে, তখন ভাবতেই পারছিলেন না ক্রিকেটাররা। সাংবাদিক সম্মেলন সেরে তখনই ড্রেসিংরুমে ফেরেন অধিনায়ক কপিল দেব। নিমেষে যেন ভারতীয় সাজঘরের পরিস্থিতি পালটে যায়। কপিল ওই অভিনেতাকে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। তার পরই দাউদকে দেখিয়ে বলেন, 'এই লোকটা কে? বেরিয়ে যাও এখুনি।'

রাগে অগ্নিশর্মা কপিলকে দেখে আর কথা বাড়ায়নি দাউদ। দ্রুত বেরিয়ে যায় ভারতীয় ড্রেসিংরুম থেকে। ১৯৮৬ সালের ভারতীয় টিমের ক্রিকেটাররা কেউই কিন্তু দাউদকে চিনতেন না। কপিলও চিনতেন না। একমাত্র চিনতেন দিলীপ বেঙ্গসরকাররই। সেই কারণেই এই ঘটনা তিনিই পরে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। কপিল বিশ্ব ক্রিকেটের সুপারস্টার হওয়ার পাশাপাশি টিমের অভিভাবকও ছিলেন। দাউদকে না চিনলেও উটকো লোক ড্রেসিংরুমে ঢুকুক, তা তিনি চাননি। ক্রোধোন্মত্ত কপিলকে দেখে আর খাপ খুলতে পারেনি দাউদ। ৩৭ বছর আগে এক আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ড্রেসিংরুম থেকে বের করে দিয়ে কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা সত্যিকারের দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

জম্মু-কাশ্মীরের নবজীবন প্রাপ্তি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠবে

সুজিত রায়

সত্তর বছর আগে 'এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'-এর দাবি নিয়ে কাশ্মীরের ভারতীয়ত্বের স্লোগান তুলতে গিয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম রাজনৈতিক পুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জীবন বলিদান করতে হয়েছিল। সত্তর বছর পর সেই ক্ষতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রলেপ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ২০১৮ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের বিশেষ আইন ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করে। আর গত ১২ ডিসেম্বর সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ সাংবিধানিক ইমারতের রূপ দিলেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দায়ের করা মামলার ষোলো দিনের শুনানি শেষে রায় দিলেন— 'সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করা কোনো ভুল পদক্ষেপ ছিল না। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সংবিধানসম্মত।' শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন সার্থক হলো। জম্মু ও কাশ্মীর এবার সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি পেল— বিশেষ অধিকারের বাঁধনে বাঁধা থাকা আর নয়। এখন থেকে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতবর্ষের মূলস্রোতের শরিক। জম্মু ও কাশ্মীর এখন আর শুধু বিশেষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ভূমি নয়। সবটাই ভারতের ভূমি, সবাই ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র। জম্মু ও কাশ্মীর গোটা ভারতের।

জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক আইনকে স্বীকৃতি দিয়ে একদা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে অন্যায় করেছিলেন, সেই অন্যায়কেই এতকাল ধরে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিল কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি যে দল জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি হিসেবে বরাবর এই বিশেষ সাংবিধানিক ধারার বিরোধিতা করে এসেছিল একটাই যুক্তিতে যে, ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত কোনো অঞ্চল ভারতীয় আইন ও অধিকারের বহির্ভূত থাকতে পারে না। কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে সেই রাজ্যের 'প্রধানমন্ত্রী' বলে দাবি করতে পারেন না। কোনো রাজ্যের নিজস্ব পতাকা সেই রাজ্যে উড়বে, ভারতের থাকবে অবনমিত— তা হতে পারে না। কোনো রাজ্যের ভূমির অধিকার সম্পত্তির অধিকার, ভোগ করবে শুধু সেই রাজ্যের বিশেষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীই তা হতে পারে না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয় সংবিধানের মানমন্দির সংসদের অধিবেশনে আওয়াজ তুলেছিলেন— এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান, দুই প্রধান থাকতে পারে না। এতে ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকেই

> জম্মু ও কাশ্মীরের নবজাগরণ হয়তো হয়ে উঠবে তেমনই একটা চাবিকাঠি যা ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের একটি সূচক হিসেবেই আগামীদিনে সাফল্যের প্রতীক হয়ে উঠবে।

অস্বীকার করা হয়। চরম এই সত্যটা জানতে পারেননি জওহরলাল আর তাঁর ভ্রাতৃসম কাশ্মীরের 'প্রধানমন্ত্রী' শেখ আবদুল্লা। চরম অন্যায় হচ্ছে জেনেও শুধুমাত্র মুসলমান ভোটকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাতে কংগ্রেস দল বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ মুখ বুজে থেকেছে। কিন্তু কালের ধর্ম সত্যকে স্বীকার করা। সুপ্রিম কোর্ট সেই কালধর্ম পালন করেছে এই রায় দিয়ে :

১. সংবিধানের ৩৭০ ধারা স্থায়ী এবং বিবিধ শর্ত পূরণ ছাড়া অপরিবর্তনীয় বলে মামলাকারীরা যে যুক্তি পেশ করেছিলেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. সংবিধানের ৩৭০ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে বলবৎ হয়েছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী একটি ব্যবস্থা হিসেবে। ফলে তা বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক।

৩। কাশ্মীরের সাংবিধান সভার অনুমতি ছাড়া এই ধারার বিলোপসাধন সম্ভব নয় বলে যে দাবি করেছিলেন মামলাকারীরা তাও আর বৈধ নয়। কারণ জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানসভা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ১৯৪৭ সালে। যে সভার কোনো অস্তিত্বই নেই, সেই সভার অনুমোদনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৪। জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভেঙে দিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিই ছিলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। অতএব মামলাকারীরা যে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি তুলেছেন তাও অবৈধ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এই রায় এক নতুন আশা জাগালো। সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভারতীয়দের ঐক্যের কথা বলেছে শীর্ষ আদালত।' বিরোধীদের হতাশায়

ফঃ ২

তিনি উৎফুল্ল হয়েছেন এমনটা নয়। তবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই ১৯৯১-এর ঘটনা যখন কাশ্মীরের লালচকে তিনি ভারতবর্ষের অখণ্ডতার দাবিতে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন এবং ঘোষণা করে এসেছিলেন, তিনি আবার পা রাখবেন কাশ্মীরে এবং এখানেই তুলবেন ভারতের পতাকা। তিনি কথা রেখেছেন। বলেছেন, শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হলো। বাস্তবায়িত হলো অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর 'ইনসানিয়াত', 'জামুরিয়ত' আর 'কাশ্মীরিয়াত'-এর বার্তা। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল যা প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে অতীব আনন্দের। তিন বছর আগে দেশের সরকার এবং সংসদ ৩৭০ ধারা বিলোপের যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তাও ছিল দেশের অখণ্ডতার স্বার্থেই। এর পিছনে কোনো রাজনীতি বা কোনো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ছিল না।

তা যে ছিল না, তা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো— কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি। কোথাও দাঙ্গা হয়নি। কোথাও জোর করে কাশ্মীরের বা পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন হয়নি। প্রমাণিত হয়েছে, কাশ্মীরের জনগণও হাঁপিয়ে উঠেছিল ৩৭০ ধারার অধীনে এক অবিশ্বাস এবং ভারতীয় হয়েও অভারতীয়ত্বের পরিবেশে জীবনধারণ করতে, যেখানে উন্নয়নে কোনও আভাস ছিল না। শিক্ষার কোনো অগ্রগতি ছিল না। মানবিক দায়ের আর কোনো সুযোগ ছিল না। যেখানে দারিদ্র ছিল নিত্যসঙ্গী। সেই সঙ্গে ছিল জঙ্গিদের অত্যাচার, পাকিস্তানের হুমকি, মৃত্যুর পরোয়ানা প্রতি মুহূর্তে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের এই নতুনভাবে বাঁচাতে, নতুনভাবে স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ আরও বৃহত্তর রূপ পাবে সেদিন যেদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আরও বৃহত্তর রূপ পাবে। সেদিন যেদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো এই দুই পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে। ২০২৪-এর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই দুই রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ভোটগ্রহণ করতে হবে। ১৯৮০ সাল থেকে এই দুই রাজ্যে যত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে।

নিঃসন্দেহে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো এই তিনটি কার্যক্রমই যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। কারণ এই কার্যক্রমই প্রমাণ করবে, জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে যে পদক্ষেপ কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছিল তা ছিল অনৈতিক। এই কার্যক্রমের সাফল্যই প্রমাণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি হেঁটেছে সঠিক পথে, সত্তর বছরের পাপকে সরিয়ে দুই রাজ্যকে নবজীবন দান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমির পটচিত্র পরিবর্তনে এ এক দুরন্ত পদক্ষেপ। তবুও ছোটো একটি ক্ষত রয়েই গেল। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে একটি বিষয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে, ২৭২ নং কনস্টিটিউশনাল অর্ডারের ২ নং প্যারাগ্রাফে বর্ণিত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের লক্ষ্যে সংবিধানের ৩৬৭ নং অনুচ্ছেদের প্রয়োগ— সংবিধানের ৩৭০ (১) (ডি) উপধারার বিরোধী। তাই ৩৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আইনগত ভাবে পুরোপুরি সঠিক নয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে সামাল দেয় তা অবশ্যই লক্ষণীয়।

এখন বিদগ্ধ রাজনৈতিক মহলে যে প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টের এই সম্মতি রাজনৈতিকভাবে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাই নিয়ে। ২০১৪ সালে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে ভারতবর্ষের রাজনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বড়ো মাপের পরিবর্তনের সূচক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ২০১৪-র বড়ো ২০১৯-এ আরও বড়ো জয়ের যে ধারাবাহিকতা নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সততার মাধ্যমে বজায় রেখেছেন, তার অগ্নিপরীক্ষা হবে আগামী বছর ২০২৪-এর নির্বাচনে। এই নির্বাচন হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতিতে যখন বিরোধীরা I.N.D.I.A. নামক প্লাটফর্ম গঠন করেও এখনও পর্যন্ত একসুরে কথা বলতে পারছেন না। অদূর ভবিষ্যতে বলবেন এমন কোনো সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। যেসব রাজ্যে বিজেপি বিরোধিতার সুর শোনা যাচ্ছিল তা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। কারণ মোদী তাঁর স্ট্র্যাটেজিক পলিটিক্স এবং পলিট্রিকসের মাধ্যমে মানুষের মনে দুটি বিষয় প্রোথিত করে দিতে পেরেছেন : ১. বিরোধীরা যা বলছেন তা শুধু বিরোধিতার জন্যই। এর পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই। ২. গতানুগতিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন মোদীজী। নতুন আবহাওয়াকে দেশের মানুষ স্বাগত জানাবেই। কারণ একঘেয়ে সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, দুর্নীতি আর বংশানুক্রমিক রাজনীতির খেলায় মানুষ বীতশ্রদ্ধ। মোদীজী বুঝে নিয়েছেন— মানুষ এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চায়।

এমনিতেই জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের সিলমোহর মোদী সরকারের একটা বড়ো জয়। তার ওপর সামনেই উদ্বোধন অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের। এই মন্দিরকে বিরোধীরা যতই ধর্মীয় সুড়সুড়ি বলে অভিধা দেন না কেন, আসলে এই শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির স্থাপনার মাধ্যমে একটি নতুন পর্যটনকেন্দ্র যে গড়ে উঠবে তা মানুষ বুঝতে পেরেছে। যে বিশাল কর্মকাণ্ড অযোধ্যায় চলেছে তাতে নিঃসন্দেহে দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে অযোধ্যার নতুন তীর্থক্ষেত্র একটি ইতিবাচক অবদান যে রাখবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে দেশের রাজনীতিতে একই মুখ, একই পরিবারের ঘন ঘন প্রত্যাবর্তনে বিরক্ত মানুষের সামনে মোদীজী ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছেন— সেইসব মানুষকে প্রশাসনক রাজনীতিতে নিয়ে আসতে যাঁদের সততা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবদান এবং রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে সততই সব প্রশ্নের উর্ধ্বে। আগামীদিনে এই প্রবণতাই বজায় থাকবে। দেশের রাজনীতি শুধু রাজনীতি সর্বস্ব না থেকে হয়ে উঠবে সামাজিক উন্নয়ন, মানবিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। বলা যায় না, হয়তো জম্মু ও কাশ্মীরের নবজাগরণ হয়ে উঠবে তেমনই একটা চাবিকাঠি যা ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের একটি সূচক হিসেবেই আগামীদিনে সাফল্যের প্রতীক হয়ে উঠবে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ
আর্থিক প্রভাব কতটা ?

সুদীপ্ত গুহ

সাত দশক ব্যাপী ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারার অর্থনৈতিক প্রভাবকে যদি এক কথায় বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে এক কথায় বলতে হয়, এই দুই ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে চাকরির বাজার (Labour market), জমির বাজার (Land market) ও পুঁজির বাজার (Capital Market)-কে কৃত্রিমভাবে বেঁধে রেখে একবিংশ শতকের জটিল গতিশীল আর্থিক কর্মযজ্ঞ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বহুমাত্রিক শিল্পবাণিজ্য, সময়োপযোগী শিক্ষা, বিশ্বমানের গবেষণা এবং আধুনিকতম স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে বিশ্বের পঞ্চম আর্থিক শক্তিধর দেশের একটি অঙ্গরাজ্য হবার সকল সুবিধা থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করেছে। ১৯৯১-তে ভারতে যে আর্থিক সংস্কার শুরু হয় তার প্রভাব যদি কোনো রাজ্যে প্রায় নেই বললেই চলে, তা হলো জম্মু ও কাশ্মীর। যদিও বাঙ্গালি হিসেবে সেটা লিখতে কুণ্ঠা ও লজ্জা হয় এই কারণে যে আমাদের রাজ্যও সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে শাসক দলগুলির অচল বামপন্থী চিন্তার জন্য। ওই রাজ্যে আপেল কুড়োতে গিয়ে আমাদের রাজ্যের শ্রমিক হত্যার পর আমাদের রাজ্যেরও অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত দৈন্যদশা সবার সামনে উঠে আসে। তবে এই প্রবন্ধ জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে আবার মূল বিষয়ে ফিরে আসি। উপরোক্ত কোনো প্রকার অর্থনীতির অংশ না হতে পারার মূল কারণ :

১. এই রাজ্যের জমি বাইরের কেউ কিনতে পারতো না। ফলে সেই জমিতে বেসরকারি বা পিপিপি লগ্নির আইনগত ঝুঁকি থেকে যেত। পরিকাঠামো কিংবা উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পে বিনিয়োগ অসম্ভব ছিল এই পরিস্থিতিতে।

২. নাগরিকত্ব পাওয়া বা সরকারি চাকরির রাস্তা ভিন রাজ্যের অধিবাসী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বন্ধ ছিল। ফলে একজন মেধাবী প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক বা অধ্যাপক মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর বা দিল্লিতে নিজের পরবর্তী প্রজন্মের যে ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন, এখানে তা পেতেন না। ফলে কেউ এখানে পরিষেবা দিতে আসার কথা ভাবতেনই না।

৩. এই ধারার ফলে ভারতীয় নাগরিকরা এখানে সংরক্ষণের সুবিধা পেতেন না। বাল্মীকি সমাজের প্রতি প্রতারণার পর এই রাজ্যে দক্ষ বা অদক্ষ কোনো শ্রমিকই আর আসতে চাননি। বরং লাদাখের মানুষ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করেছে।

৪. এই ধারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে একটা আশার আলো ছিল। এই ধারা এই রাজ্যের অঘোষিত দুই পরিবারের (আবদুল্লা ও মুফতি) এবং তাঁদের আমির ওমরাহদের কাছে একটা স্থায়ী বিনিয়োগের মতো কাজ করতো। সুলতানি পরিবার, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এবং পাকিস্তানের এই অলিখিত যুগলবন্দি এই রাজ্যের আর্থিক বিকাশের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা ছিল।

৫. নিজের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এরা বিধানসভা ও লোকসভার সীমানা এমনভাবে নির্বাচন করতো যাতে কাশ্মীরি পণ্ডিত বা লাদাখের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কোনোদিনই রাজ্যের ক্ষমতায় আসতে না পারে। ভারতের নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। ফলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমিত রাখত দুই পরিবার।

এবার ওই দুই পরিবারের আমির ওমরাহদের মতামতটা একবার শুনি। জম্মু ও কাশ্মীরকে দু'ভাগে ভাগ এবং ৩৭০/৩৫-এ বিলোপের তিন মাস পর, ২০২০-তে একটা সাক্ষাৎকারে কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আশিক যে ক্ষতির ফিরিস্তি দেন, সেই তালিকাতে প্রথমে একবার

চোখ বুলিয়ে নিই। আশিকের মতে, এই বিল পাশ হবার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্যের কৃষি, হস্তশিল্প, রেশম চাষ, উদ্যান পালন তথা আপেল চাষ, পর্যটন ও পরিবহণ, তন্তুবায় শিল্প ও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ হারান। ইন্টারনেট বন্ধ থাকার জন্য রপ্তানি ও ই-কমার্স সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় কয়েক মাস। তিনি আরও উল্লেখ করেন, কাশ্মীরে ৫০ শতাংশ জমি অরণ্য। এখানে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই।

আশিকের দেওয়া তথ্য ও বিবরণ শুনে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন কেন্দ্র এই দুই আইন বিলোপ করতে গেল? কেন প্রয়োজন হলো এই সমুদ্রমন্থনের? কাশ্মীরবাসী কি শুধুই বিষ পেল নাকি আগামীদিনে অমৃতও অপেক্ষা করেছে ভূস্বর্গের অধিবাসীদের জন্য? উত্তরে আসার আগে, যদি আমরা জনাব আশিকের মতামত বিশ্লেষণ করি তবে এর দুটি ভাগ আছে। প্রথমটি ওঁর বিল-পরবর্তী অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ, যেটা খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়টি জমির মালিকানা বাইরের শিল্পপতিদের হাতে চলে যাবার ভয়, যা তাঁর স্বার্থপর তথা রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক।

গত ২০ বছরে এই রাজ্যে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ মাত্র ৩৯০ মিলিয়ন ডলার, যা নগণ্য বললেও কম। এখানে এমন কোনো বেসরকারি সংস্থা নেই যার কর্মী সংখ্যা ৫০০-র বেশি কিংবা পেইড আপ ক্যাপিটাল ১০ কোটির বেশি। রাজ্যের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৫০ শতাংশ। রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতী রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত মানুষের ভাগ্যে জুটছে দারিদ্র ও অনিশ্চয়তা।

কিন্তু রাজ্যের দুই অঘোষিত সুলতান পরিবারের ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী চাইছেন না যে বিদেশি বা ভিনরাজ্যের বিনিয়োগ। কারণ স্থিতাবস্থা ওই দুই পরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষের কাছে অলিগোপলি (oligopoly) ভোগ করার একমাত্র রাস্তা। ১৯৯১-তে উদার অর্থনীতি আসার পর রাহুল বাজাজ-সহ বিভিন্ন গান্ধী পরিবার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ঠিক এই কারণে নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতির স্থিতাবস্থার পরিবর্তন চাননি। পরে অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেছেন যে ১৯৯১-পূর্ব ব্যবস্থাই ভুল ছিল। আশিকও এখন সেই সময়ের রাহুল বাজাজের মতো ভাবছেন।

আর এখানেই জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থব্যবস্থা ও শিল্প নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

১. গত ৩২ বছর কোনো সফটওয়্যার কোম্পানি সেভাবে কাশ্মীরে বিনিয়োগ করেনি কেন? ২. ওয়ালমার্ট কাশ্মীরে তার হিমঘর বানিয়ে সারা পৃথিবীতে কাশ্মীরের আপেল রপ্তানি করতো না কেন? ৩. সেরা শিক্ষকরা এই রাজ্যে পড়াতে আসতেন না কেন? ৪. সেরা ডাক্তার এই রাজ্যে প্র্যাকটিস করতেন না কেন? ৫. আন্তর্জাতিক হোটেল ব্যবসায়ী এখানে হোটেল খুলতো না কেন? ৬. ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো এখানে তাদের ট্যুরিজম সেন্টার খোলেনি কেন? ৭. এখানে সড়ক বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজি আসেনি কেন? ৮. এখানে সুইজারল্যান্ডের মতো ফিনান্সিয়াল হাব হলো না কেন? ৯. এখানে সেরা গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হলো না কেন? ১০. এখানে হলিউড বা বলিউডের শুটিং হয় না কেন? ১১. এখানে মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষায় সিনেমা তৈরি হয় না কেন?

অথচ এই সবকিছুরই যোগ্য জায়গা এই রাজ্য। উত্তর এই দুটি অভিশপ্ত আইনের বিভিন্ন ধারায় লুকিয়ে। স্বাধীনতার পর এই দুটি ধারাকে ঢাল করে এই রাজ্যের সংখ্যাগুরুরা এই রাজ্যের সুচাগ্র মেদিনী কোনো বেসরকারি, বিদেশি বিনিয়োগকারী তো দূরের কথা তাঁদের নিজেদের কন্যা দেশের অন্য অঙ্গরাজ্যের নাগরিককে বিবাহ করলে, সেই জামাতাকেও দিতে রাজি ছিল না। এই রাজ্যে সরকারি চাকরির দরজা ভিন রাজ্যের ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদদের জন্য বন্ধ। ফলে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যদি নাও থাকতো, তবু এই রাজ্যে কেউ বিনিয়োগে রাজি হবে না। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উৎসও এই ধারাই। এই ধারার দৌলতে এই রাজ্যের নাগরিক অতি কম মূল্যে নিরামিষ থেকে আমিষ সবরকম খাদ্য সামগ্রী সরকার থেকে পায়। তাদেরই একটি অংশের অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা হয়ে রাজ্যকে বিচ্ছিন্নতাবাদের স্বর্গ বানিয়ে ছেড়েছে। এরা এতো অলস যে আপেল কুড়োতে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক নিয়ে আসে।

এবার আসি এই রাজ্যের ক্ষমতাভোগী গোষ্ঠী ব্যতীত বাকিরা কি অবস্থায় আছে এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থা কী? এরা কী আশা করতে পারে এই সংবিধান সংশোধন থেকে?

প্রথমে আসি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথায়। এরা মূলত জম্মুর বাসিন্দা হলেও কাশ্মীরেও এরা একসময় ছিলেন। এরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে, স্বাধীন দেশে, শুধুমাত্র একটি অঙ্গরাজ্যে সংখ্যালঘু হবার অপরাধে এদের নিজদেশে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হবে। বিশ্বের চতুর্থ শক্তিশালী সেনাবাহিনীও তাঁদের বাঁচাতে পারবে না, এটা তারা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বিলোপের সঙ্গে এই রাজ্যের আসন পুনর্বিন্যাস করে জম্মুর নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এদের ভাগ্য এঁরাই নির্ধারণ করেন। এদের ভাষা মূলত কাশ্মীরি ও ডোগরী। কিন্তু এঁদের পড়াশুনা করতে হতো হিন্দি ও উর্দুতে। এদের মাতৃভাষায় কোনো সিনেমা বা নাটক হতো না। এই বিল দুটির বিলোপে তাঁদের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনবে। বিধানসভায় এদের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, বাল্মীকি সমাজ। পঞ্চাশের দশকে ময়লা পরিষ্কারের জন্য নিয়ে এসেছিল

কাশ্মীরি শাসকরা। কিন্তু নাগরিকত্ব দেয়নি। ভারতীয় সংবিধানের দেওয়া সংরক্ষণ থেকে এরা বঞ্চিত। সরকারি চাকরি, জমির মালিকানা কিছুই পায়নি এই প্রতারিত সমাজ। এদের পরবর্তী প্রজন্মও এখনো সরকারি সব রকমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নিজের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বসবাস করছেন এরা। বাংলাদেশিদের নাগরিকত্ব নিয়ে সোচ্চার বুদ্ধিজীবীরা এদের অধিকার নিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সাত দর্শক নির্বাক ছিল। এতদিনে এরা বিচার পেলেন।

তৃতীয়ত, লাদাখের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ। গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে যদি কোনো প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়, তবে ৭২ বছর সংখ্যালঘু হবার যে মূল্য এরা দিয়েছে তা উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এদের মাতৃভাষা লাদাখী, তিব্বতী ও বাল্টি। কিন্তু এদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হতো। লাদাখ ও কাশ্মীর উপত্যকার পরিবেশ আলাদা হলেও সরকারি আবাসন হিসেবে এদের কাশ্মীরের মতো বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হতো। এখানে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন বা ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। রাজ্য সরকারি বাজেটের মোটামুটি ৫ শতাংশ এই অঞ্চলের ভাগ্যে জুটতো। পরিকাঠামো খুব খারাপ। জম্মু ও কাশ্মীরে বিদ্যুৎ দিয়ে বাঁচলে তবে এরা পেত। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল এই অংশ। বাল্মীকিদের মতো এরাও সংরক্ষণের সুবিধা পেতেন না। পড়াশোনার সুযোগ ছিল না বলে পুলিশ কনস্টেবলের বেশি এগোনো যেত না। অথচ মেধা প্রচুর। থ্রী ইডিয়টস্ ছবির আমির খানের চরিত্রটি যাঁর অনুপ্রেরণায় লেখা, সেই প্রযুক্তিবিদ তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচু এই লাদাখেরই মানুষ। আজ লাদাখ একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই দুই বিলের বিলোপে এদের জীবনেও বাল্মীকিদের মতো নতুন সূর্যোদয় হয়েছে।

এছাড়া ভাগ হওয়া দুটি রাজ্যের সরকারি কর্মী, শিক্ষক ও ডাক্তাররা এখন থেকে কেন্দ্রের হারে বেতন ও অবসরকালীন ভাতা পাবেন। সারা ভারতের মতো সমস্ত অর্থব্যবস্থা এই রাজ্যও পাবে, যেখানে ল্যান্ড মার্কেট, লেবার মার্কেট ও ক্যাপিটাল মার্কেট নিজের স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থব্যবস্থার অংশ হবে এবং গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়বে সাধারণ মানুষের আয়। শিক্ষিত সমাজকে অন্য রাজ্যে চাকরি করতে যেতে হবে ন। অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত গরিবদের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। লাদাখী, কাশ্মীরি, ডোগরীস, বাল্টি ভাষায় নাটক, সিনেমা, টিভি সিরিয়াল তৈরি হবে। আরও নতুন নতুন জীবিকা প্রবেশ করবে এই রাজ্যে। মানুষ উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্বাদ পাবে। বাল্মীকি সমাজের মানুষ সংরক্ষণের আওতায় পড়বে ৭২ বছর পরে এবং সরকারি চাকরি পাবে। লাদাখে কেন্দ্র সরকার এর মধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানানোর কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। তাঁরা এবার এনটিপিসি/পাওয়ার গ্রিড থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ পাবে। চক্রব্যূহ ভেঙে এই কলিযুগের অভিমন্যুদের বাঁচাতে আজকের দ্বারকা (যা এখন গুজরাটের অংশ) থেকে এসেছেন দুই শ্রীকৃষ্ণভক্ত। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবেই ভূস্বর্গে। সপ্তরথীদের (আবদুল্লা পরিবার, মুফতি পরিবার, বিচ্ছিন্নতাবাদী, পাকিস্তান, সুলতানদের আমির-ওমরাহ, দেশের বামপন্থী সংবাদমাধ্যম এবং নেহরুর বংশধরদের স্তাবকগণ) সমস্ত রকম রাষ্ট্রবিরোধী রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে এই সংবিধান সংশোধন। সুপ্রিম কোর্ট আজ শেষ সিলমহরটা মেরে দিল। □

ধারা ৩৭০ ছিল ভারতের সঙ্গে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা

১৯৫৩ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার যোগ্য উত্তরসূরী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অবসান ঘটেছে ৩৭০ ধারার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের ৩৭০ ধারা সমর্থন আজও অব্যাহত।

মন্দার গোস্বামী

বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। স্বাধীনতার পর কুচক্রী কমিউনিস্ট, কংগ্রেস, আবদুল্লাদের সমবেত উৎসাহে সংবিধানে 'ধারা ৩৭০' নামক যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন হলো। মহামান্য প্রধান বিচাপতির নেতৃত্বে সাংবিধানিক বেঞ্চের সমবেত রায়, মোদী সরকারের ৩৭০ ধারা বাতিল একটি সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত। বস্তুত, ৩৭০ ধারা ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতার উপর এক ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯৪৯ সালে শেখ আবদুল্লা ড. বি আর আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদার অনুরোধ করলে, ড. আম্বেদকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন— You want India to defend Kashmir, give Kashmiris equal rights all over India, but you want to deny India and Indians all rights in Kashmir. I am the law minister of India, I can not be a party to such a betrayal of the nationl interest. (The Statesman 05.04.94) অর্থাৎ 'আপনি চান, ভারত কাশ্মীরকে রক্ষা করবে, ভারতের সর্বত্র কাশ্মীরিদের সমান অধিকার থাকবে, অথচ কাশ্মীরে ভারত ও ভারতীয়দের কোনও অধিকার থাকবে না। আমি ভারতের আইনমন্ত্রী, জাতির স্বার্থের সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারব না'।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছিল। করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তার প্রোৎসাহেই সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল ৩৭০ ধারা। এই ধারাকে হাতিয়ার করেই শেখ

আবদুল্লা ১৯৫৬ সালে কাশ্মীরের জন্য রচনা করেন পৃথক সংবিধান। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন 'উজির-এ আজম' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যপাল 'সদর-এ- রিয়াসত্'। তৈরি হলো কাশ্মীরের নতুন পতাকা। বিদেশ, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও অর্থ ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের আর কোনও বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার ভারত সরকারের থাকল না। কাশ্মীরে ভারত সরকারের কোনো আইন প্রণয়ন করতে হলে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের সম্মতি বাধ্যতামূলক করা হলো। জম্মু-কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া কাশ্মীরে কেউ এক ইঞ্চি জমি পর্যন্ত কিনতে পারতেন না, চাকরির আবেদন করতে পারতেন না। কাশ্মীরি মহিলারা রাজ্যের বাইরের কাউকে বিয়ে করলে সম্পত্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতেন। রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণের একমাত্র অধিকার ছিল জম্মু-কাশ্মীর সরকারের।

এছাড়াও মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত বিনাব্যয়ে শিক্ষা, বিনামূল্যে পুস্তক, নামমাত্র মূল্যে রেশন, খাদ্য সামগ্রী-সহ বিবিধ সুবিধা। এর সঙ্গে যুক্ত হলো 'পারমিট প্রথা' অর্থাৎ কাশ্মীরে প্রবেশ করতে গেলে অবশিষ্ট ভারতের নাগরিকদের বিশেষ অনুমতি বাধ্যতামূলক করা হলো। এইভাবে দেশের মধ্যেই তৈরি হলো আরেকটি দেশ। ৩৭০ ধারার মাধ্যমে কাশ্মীরকে ঘুর পথে ভারত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো। নেহরুজীর সুপ্ত বাসনা বাস্তবায়িত হলো। আসলে নেহরুজী কখনোই চাননি কাশ্মীর ভারতভুক্ত হোক। স্বাধীনতার পর পরই যখন সদ্য গঠিত পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করল, তখন নেহরুজী সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর বিবিধ চাপে পড়ে নেহরুজী যখন কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হানাদারের ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনারা কাশ্মীরের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এই সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘের কার্যকর্তা অধ্যাপক বলরাজ মাধোক কয়েকশো স্বয়ংসেবককে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগর শহর রক্ষা করেছিলেন। উপযুক্ত এরোড্রাম না থাকার কারণে যখন সেনাবহিনীর বিমান অবতরণ করতে পারছিল না তখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই রাতদিন পরিশ্রম করে এরোড্রাম প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

এরপর পালটা আক্রমণ করে হানাদারদের তাড়িয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে, তখন নেহরুজী একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে বিষয়টিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গেলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হলো। সেনাবাহিনী ফিরে আসতে অস্বীকার করায় দিল্লি থেকে তাদের রসদ ও অন্যান্য সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। কমিউনিস্টরা দাবি তুলেছিল, 'কাশ্মীর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ভারত হাত ওঠাও।' ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে আসতে বাধ্য হলো। সেনাবাহিনী ফেরত আসার সঙ্গে সঙ্গে অরক্ষিত স্থানগুলি পাকিস্তান দখল করে নিল। সেই অংশ আজও 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর' (POK) নামে বিষাক্ত ঘা হয়ে ভারতের বুকে বিরাজ করছে। একদিকে POK, অপরদিকে ৩৭০ ধারা, —কাশ্মীর এক জ্বলন্ত সমস্যায় রূপান্তরিত হলো। আর এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী জওহরলাল নেহরু। কমিউনিস্টরাও কম নয়, সাম্যের কথা বলে যারা গলা ফাটান, সেই মার্কসবাদীরা গলা ফাটিয়ে সংসদে, সভা মঞ্চে সর্বত্র এই অতি অসাম্য, অন্যায়, নীতিহীন ব্যবস্থাটিকে সমর্থন করেছেন। একমাত্র বিরোধিতা করলেন তৎকালীন জনসঙ্ঘের নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'এক দেশ মেঁ দো নিশান, দো বিধান, দো প্রধান নেহি চলেগা নেহি চলেগা'। তিনি পারমিট প্রথা এবং ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবিতে ১৯৫৩ সালের ১০ মে সহকর্মীদের নিয়ে কাশ্মীর অভিযান করেন।

নেহরুর পরামর্শে শেখ আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কারাবন্দি করেন এবং বন্দি অবস্থাতেই তাঁর রহস্যমৃত্যু হয়। এরপর ঝিলম দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ৩৭০ ধারা নামক তথাকথিত অস্থায়ী ব্যবস্থাটি ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে জগদ্দল পাথরের মতো জম্মু-কাশ্মীরে জাঁকিয়ে বসেছে। শুরু হলো জেহাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী তথাকথিত আজাদির লড়াই। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠলো অসংখ্য জিহাদি ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠী, রাজনৈতিক সংগঠন। শুরু হলো হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, বিতাড়ন। কাশ্মীরের মসজিদ থেকে মাইকে দিবারাত্র শোনা যেত ভারত বিরোধী, হিন্দু বিরোধী প্রচার। উপত্যকায় হিন্দু আচার-আচরণ নিষিদ্ধ হলো। বাস থেকে নামিয়ে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করা হতো, শিশুদেরও বাদ দেওয়া হতো না। এসব কিছুই দেশবাসী 'কাশ্মীর ফাইলস্' সিনেমায় দেখেছে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে নিজভূমে পরবাসী হলেন। তাঁরা দিল্লির ত্রাণশিবিরে দিন কাটাতে লাগলেন। ভারতের জাতীয় পতাকা সেখানে নিষিদ্ধ, যত্রতত্র দেখা গেল পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। কশ্যপ মুনির নামাঙ্কিত তপস্যা পূত ভূস্বর্গ কাশ্মীর এইভাবে হিন্দুশূন্য হয়ে গেল। সৌজন্যে ধারা ৩৭০, ব্র্যাকেটে জওহলাল নেহরু।

কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলেছে। ১৯৫৩ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার যোগ্য উত্তরসূরী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অবসান ঘটেছে ৩৭০ ধারার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের ৩৭০ ধারা সমর্থন আজও অব্যাহত। দেশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ার পরও এরা ৩৭০ ধারার সমর্থনে চিল চিৎকার জুড়েছেন। চিদাম্বরম, কপিল সিব্বল, আবদুল্লারা সুপ্রিম কোর্টে গেছেন। কোর্টে হেরে যাবার পর মনের দুঃখে আজ তারা শোক পালন করছেন। তাদের কারও কারও বক্তব্য পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাদের কণ্ঠে পাকিস্তানের প্রতিধ্বনি। কেন্দ্রের দৃঢ় শাসনে, বিবিধ কল্যাণকামী উদ্যোগে দ্রুত বদলাচ্ছে কাশ্মীর, বদলাচ্ছে কাশ্মীরি মানসিকতা, উপত্যকায় ফিরে আসছে শান্তি। বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলিও আজ বিধ্বস্ত প্রায়। কাশ্মীরের ক্লক টাওয়ারের মাথায় পত পত করে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা। জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহের পুত্র— করণ সিংহ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সবাইকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ধারা ৩৭০ উচ্ছেদের লক্ষ্য সমাপ্ত। কিন্তু এখনো কাশ্মীর সম্পূর্ণ হয়নি। পাক অধিকৃত কাশ্মীর এখনও শত্রুকবলিত। □

ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও জামিয়া মিলিয়ার যোগ প্রমাণিত

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

২০২০ সালের দিল্লির জঙ্গি হামলায় বেশ কয়েকজন হিন্দু খুন হয়েছিল। তদন্ত সংস্থার মতে এতে ইসলামিক স্টেটের হাত আছে। আইসিস জঙ্গি আরশাদ ওয়ারসি ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (এএমইউ বা আমু) ওয়াজিহুদ্দিন আলি খানের গ্রেপ্তার এবং শারজিল ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে তা স্পষ্ট হয়। ৭ নভেম্বর, ২০২৩ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের 'অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড' (এটিএস) ছত্তিশগড়ের দুর্গ থেকে ওয়াজিহুদ্দিন আলি খানকে গ্রেপ্তার করেছিল। সে মূলত সেখানকারই বাসিন্দা। তবে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে। সে সেখানে সমাজ বিজ্ঞান পড়াতো, হিন্দু ছাত্রও ছিল তার। তার মতের অনুসারীদের কাছে সে 'আমির' (রাজা) নামে পরিচিত এবং ভারতের ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড়। গ্রেপ্তারের পরে তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে লখনউ নিয়ে যাওয়া হয়।

নভেম্বর, ২০২৩-এর দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে এএমইউ সহযোগী আইসিস জঙ্গি আবদুল্লা আরশালান এবং মাজ বিন তারিককেও এটিএস গ্রেপ্তার করেছে। তিনজনই পুনে আইসিস নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটিএস আরশালান ও তারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ে ওয়াজিহুদ্দিনের নাম উঠে আসে। এটিএস বলেছে, ওয়াজিহুদ্দিন আইসিস হ্যান্ডলার ছিল এবং সে-ই উত্তরপ্রদেশে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করছিল। সে মুসলমান যুবকদের জিহাদ চালানোর প্রশিক্ষণ এবং আইসিসে নিয়োগ করত। ওয়াজিহুদ্দিনই মাস্টারমাইন্ড ছিল, সে-ই আরশালান (পেট্রোলিয়াম ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) ও তারিককে (বি.কম ছাত্র) আইসিস জঙ্গি হিসেবে নিয়োগ করেছিল। এটিএস প্রেস রিলিজ স্পষ্ট উল্লেখ করেছে যে, বছরের শুরুতে পুনে আইসিস মডিউলে গ্রেপ্তার হওয়া শাহনওয়াজ ও রিজওয়ান জেহাদি 'আমু'র ছাত্র সংগঠনের ঘনিষ্ঠ ছিল। তারাই সেই আইসিস জঙ্গি যারা আমু থেকে অন্যান্য আইসিস জঙ্গিদের রিক্রুট করেছিল।

ওয়াজিহুদ্দিন এবং গ্রেপ্তার হওয়া অন্যদের থেকে প্রচারপত্র উদ্ধার হয়েছে। তারা এই প্রচারপত্র একে অপরের সঙ্গে এবং অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে চালাচালি করত। প্রসঙ্গত, ৩ অক্টোবর শাহনওয়াজ, রিজওয়ান ও আরশাদ ওয়ারসি পুনে আইসিস মডিউলে গ্রেপ্তার হয়েছিল, শাহনওয়াজ ওরফে শফি উজ্জামাকে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল রাজধানীর এক আস্তানা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। তারা অযোধ্যা, অক্ষরধাম মন্দির এবং চাবার হাউসে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করছিল। প্রধান অভিযুক্ত শাহনওয়াজের মাথার দাম ছিল ৩ লক্ষ টাকা।

এনআইএ শাহনওয়াজের কাছ থেকে আইইডি তৈরির রাসায়নিক ও অন্যান্য অপরাধমূলক উপাদান উদ্ধার করেছে। হাজি আলি, আবদুল্লা ফাইয়াজ শেখ ওরফে ডায়াপারওয়ালা এবং তালহা লিয়াকত খান নামে আরও তিন সন্দেহভাজন জঙ্গির প্রত্যেকের সম্পর্কে তথ্যের জন্য এনআইএ শাহনওয়াজ, রিজওয়ান আবদুলকে গ্রেপ্তারের ৩ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শাহনওয়াজ, আবদুল্লা ও রিজওয়ান অ্যাপের মাধ্যমে ইসলামিক স্টেট মিশনে যোগদানের জন্য উগ্রপন্থী হয়েছিল এবং দেশে সন্ত্রাস চালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

পুলিশ জানিয়েছে শাহনওয়াজ আলম (৩১) হাজারিবাগের, মোহাম্মদ রিজওয়ান আশরাফ (২৮) লখনউয়ের এবং মহম্মদ আরশাদ ওয়ারসি ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়ার জেলার বাসিন্দা। রিজওয়ান আশরাফকে লখনউ থেকে, শাহনওয়াজকে জৈতপুর থেকে এবং ওয়ারসিকে মোরাদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শাহনওয়াজের কাছ থেকে লোহার পাইপ, কেমিক্যাল, টাইম ডিভাইস, পিস্তল কার্তুজ-সহ বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া তিন সন্ত্রাসীর কার্যকলাপ পরিচালনা করছে পাক আইএসআই এবং আইসিস। পুলিশ জানিয়েছে যে তিন জঙ্গি আইসিসের প্রতি অনুগত এবং তাদের পাকিস্তানি আইএসআই হ্যান্ডলারদের ও আইসিসের সঙ্গে সংযোগ ছিল। আইসিস পিছন থেকে কাজ করেছিল যাতে তারা আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজরে না আসে।

শাহনওয়াজ ২০১৬-এ দিল্লি এসেছিল। সে শাহিনবাগে যায় র‍্যাডিক্যাল ইসলামিক গ্রুপ হিজবুত-তাহরির বক্তৃতা শুনতে। শাহিনবাগে থাকাকালীনই সে আইসিসের প্রতি আকর্ষিত হয়। এ সময় রিজওয়ানের সঙ্গে শাহনওয়াজের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। দুজনই ইসলামিক স্টেটে বা আইসিস দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মজার বিষয়, আরশাদ ওয়ারসিও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-টেক শেষ করার পরে ২০১৬ সালে দিল্লি এসেছিল। বর্তমানে সে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে পিএইচডি করছে।

সে শাহনওয়াজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। ওয়ারসি জামিয়া নগরে থাকত। তারা শাহিনবাগেও উগ্র ইসলামিক কর্মসূচিতে ছিল। 'মোস্ট ওয়ান্টেড' শাহনওয়াজকে আশ্রয় দিয়েছিল এই আরশাদ ওয়ারসি। ওয়ারসি জঙ্গি হামলার পরিকল্পনার সঙ্গেও জড়িত ছিল। ওয়ারসিকে জেরা করে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল শাহনওয়াজকে সনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

আরশাদ ওয়ারসি অন্যান্য আইসিস সন্ত্রাসীদের সঙ্গে দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে, সে দিল্লির হিন্দুদের ওপর হামলায়ও জড়িত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, শারজিল ইমামের সঙ্গে আরশাদ ওয়ারসি সহিংসতার বীজ রোপণ করেছিল যা থেকে ২০২০ সালে দিল্লির হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছিল। □

সংসদে হামলাকারীরা ভারত সরকারের চোখ খুলে দিল

ভারতের সংসদ ভবনে অবিষাক্ত-গ্যাস-হামলাকারীরা কি অনলাইনে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিল? এদের কঠিন শাস্তি দিয়েও পদ্মশ্রী পদক দেওয়া হোক। বিষয়টা খুব গভীরভাবে তদন্ত করে, প্রয়োজন বোধে হিপ্টোনাইজ করে এদের ভিতরের খবর জানা উচিত। তবে এরা ভারত সরকারের যথেষ্ট উপকার করলো। এরা সরকারি নিরাপত্তাব্যবস্থার খুঁত ধরিয়ে দিল। ভারতের কোর্ট যা মাছের বাজারের সমতুল্য, সেখানে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রাইভেসি রক্ষার ব্যবস্থা নেই। ইউরোপের লোয়েস্ট কোর্টও চিঠি দিয়ে আলাদা ভাবে বাদী ও বিবাদীকে তাদের উকিল মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়, কোন তারিখে, কটার সময়, কোন রুমে তাদের মামলার শুনানি হবে। কোর্টে ঢুকতে গেলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন থাকে তার ১০ মিনিট আগে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করে ঢোকানো হয়, সঙ্গের ব্যাগও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করার পর আবার খুলে চেক করা হয়। তবে জুতোর ভিতর অবিষাক্ত গ্যাস থাকলে কোন মেশিন ধরতে পারে তা আমার জানা নেই। আর কোর্টে যখন যে মামলা চলে, সেই বাদী-বিবাদী এবং তাদের উকিলরাই থাকে, অন্য কোনো উকিল বা দর্শক থাকে না, যাতে বাদী বিবাদীর প্রাইভেসি বজায় থাকে। ভারতে কোথাও কারও প্রাইভেসি রক্ষা করা হয় না। অন্যের খবর সহজে জানা যায়। ভারতীয় উকিলদের কোর্টের অফিস ই-মেল করে জানিয়ে দেয় না, উকিলরা যেন ওই জজের কোর্টে না আসেন। তাতে মক্কেলের আর্থিক সময়ের ক্ষতি হয়, উকিলের সময় নষ্ট হয়। কোনো মক্কেল জজ তথা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে। অবিষাক্ত গ্যাস- হামলাকারীরা ভারত সরকারের যথেষ্ট উপকার করলো। সেজন্য এদের জেলের শাস্তি দিয়েও পদ্মশ্রী পদক দেওয়া হোক!

—**মৃণাল মজুমদার,** বার্লিন, জার্মানি।

বার, তিথি মেনে নিরামিষ খেলে শরীর সুস্থ থাকবে

আধুনিক বিজ্ঞান মতে মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার, রবিবার এবং অষ্টমী, একাদশী, চর্তুদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তিতে নিরামিষ খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। যেমন, মহাদেব শিব শাম্বপুরাণে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'রবিবারে মাংস ভোজনে চিররোগী হয়'। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান না মেনে খাদ্য গ্রহণে ধর্ম ও সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়, মারণ রোগব্যধিতে আক্রান্ত হতে হয়। আবার একাদশীর ব্রত ও চৌদ্দশাকের ব্রত পালন করতে পারলে যে কোনো মারণ রোগব্যধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগব্যধির নিরাময় আগাম প্রতিরোধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিজ্ঞানের পথ কঠিন, তবে মেনে চললে একটা সুবিধা যে রোগব্যাধির থেকে রেহাই অবশ্যই পাওয়া যাবে। ঈশ্বরকে একগুণ দিলে সহস্রগুণ ফিরে পাওয়া যায়। (দ্র: গর্গ সংহিতা)। কারণ আমরা প্রকৃতির জীব, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন আমাদের জীবন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে, প্রকৃতি অবশ্যই তার শোধ নেবে। অর্থাৎ রোগব্যাধিতে শরীর জর্জরিত হবে।

—**অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ,**
দেউলটি, হাওড়া।

উলটা বুঝিলি রাম!

সংবাদে প্রকাশিত, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে ভারতের পরাজয়ে বাংলাদেশিরা উল্লসিত হয়ে আনন্দোৎসবে মেতেছিল। কিন্তু এর কারণ কী হতে পারে? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পরাজয় হলেও এর একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেত। যে ভারতের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের সৃষ্টি হতো না, যে পাকিস্তানি সেনারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষাধিক বাংলাদেশির মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিল, সেই বাংলাদেশিরা ভারতের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ কেন? অথচ ভারতের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশিদের টিকে থাকা সম্ভবপর নয়, তবুও ভারতের প্রতি বাংলাদেশিদের ঘৃণা আশ্চর্যজনক মনে হয় না কি? অথচ সুচিকিৎসা এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশিদের ভারতেরই মুখাপেক্ষীই থাকতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন হয় ভিসা যেটা পেতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লেগে যায়। আমি প্রস্তাব, দিয়েছিলাম বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করা হোক। কিন্তু উলটা বুঝিলি রাম! সংবাদে প্রকাশ, দুই দিনের মধ্যে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

লুঠেরার দল

গত ১১ ডিসেম্বর স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, ভারতবর্ষকে বিদেশি লুঠেরার দল বার বার লুঠ করেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর আর এক লুঠেরার দল ভারতের শাসনভার হাতে নিয়ে কয়েক দশক ধরে দেশকে লুণ্ঠন করেছে। খুবই সত্য বিশ্লেষণ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওই দলটি কংগ্রেস। তারা এখন নানাভাবে দেশকে লুণ্ঠন করে চলেছে। সম্প্রতি তাদের রাজ্যসভার সাংসদ ধীরাজ সাহুর বাড়ি থেকে আয়কর আধিকারিকরা ৩৫৩ কোটি টাকা উদ্ধার করেছেন। এই দলটি যে সত্যিই লুঠেরার দল তা বহুবার প্রমাণ হয়েছে। এদেরই উপজাত দল পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল আজ চোরেদেরও দল বলে পরিচিত হয়েছে। এরা পশ্চিমবঙ্গে চাকরি চুরি, রেশন চুরি, গরিব মানুষের আবাস যোজনার টাকা চুরি ইত্যাদিতে বিদেশি লুঠেরারদের হার মানিয়েছে। এদের দেশ থেকে বিদায় করতে না পারলে দেশের মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

—**স্নেহাশিস আচার্য,**
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

সংসদে হামলা মোদী সরকারকে অপদস্থ করার জন্য

গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলা হয়েছিল। কোনো হতাহত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে

৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজনকে পুলিশ খুঁজছিল। তাকেও গ্রেপ্তার করেছে। তার সঙ্গে আবার আমাদের রাজ্যের যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছে। তার সঙ্গে নাকি এক তৃণমূল বিধায়কের যোগাযোগ রয়েছে। আসলে বিরোধীদলগুলি বুঝে গিয়েছে, ভোটের লড়াইয়ে কোনোভাবেই মোদীকে পরাস্ত করা যাবে না। তাই তারা বিভিন্ন চক্রান্তের পথ বেছে নিয়েছে। এই হামলাকারীদের একজন আবার পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। যাকে পুলিশ পরে গ্রেপ্তার করেছে সেই ললিত ঝা কলকাতার বড়োবাজারে ভাড়া থাকতো এবং হালিশহরে নীলাক্ষ আইচ নামে একজনের সঙ্গে এনজিও চালাত। এদের পেছনে কারা তদন্ত সংস্থা তা অবশ্যই খুঁজে বের করবে।

—হরেন বর্মণ,
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

আমার মতে সংবিধানের ৩৫৫ ধারা ও ৩৫৬ ধারার কী প্রয়োজন সেই ব্যাপারে আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্বস্তিকা পত্রিকার মাধ্যমে ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ নিয়ে অনেকেই এক সময় মতামত রেখেছেন এবং বিশেষজ্ঞরা সুচিন্তিত বক্তব্যও রেখেছেন। ৩৫৫ ধারা প্রসঙ্গে একটা বক্তব্য এই স্বস্তিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি— সেটা হলো এই ধারাটি to protect the elected Government. এটা পূর্বসূরিদের মতো কোনও সরকারকে ভেঙে দেবার জন্য নয়— যেমন এক কথায় বিজেপির চারটি সরকারকে এরকম মর্জি মাফিক আগের কংগ্রেসি কেন্দ্র সরকার ফেলে দেয়। ৩৫৬ ধারাটি বর্তমান সরকার বজায় রেখেছে, বহু মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে এবং বহু অপদার্থকে পদার্থ করে ধরে রেখেছে। পরিণতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি নির্লজ্জ, অগণতান্ত্রিক দেশদ্রোহীদের আস্থাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে। অনেককেই বলতে শুনেছি মরছে মুসলমানরা— মারছেও মুসলমানরা, এতে তোমার কী এসে যাচ্ছে? মুসলমানরাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এযাবৎ ফলো করছে— তাতে করে মুসলমান মহিলারাও কী ধর্মের নামে অপরাপর ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন)-কে গ্রহণ করছে? উলটে তাঁদের বক্তব্য হিন্দুরা সংখ্যায় বাড়লে মুসলমানদের কী হবে? সুদূরপ্রসারী চিন্তার দ্বারা নরেন্দ্র মোদী নাকি সরকার চালাচ্ছে? অনুপ্রবেশকারী ও সনাতন পন্থীদের ব্যাপারে সঠিক পন্থাটি কী? —এই ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত জানতে চাই। আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ৩৫৬ ধারাটির প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

আমরা কোন শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালাবো?

সমগ্র হিন্দু সমাজ আজও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সঠিক মূল্যায়ন করতে শিখল না। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আজও সমাজের বহু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের নামে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁকেই আবার চরিত্রহীন লম্পটের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে চলেছেন প্রতিটি হরিবাসরে। শ্রোতারাও আকুল হয়ে শুনে চলেছেন সেই কলঙ্ক লেপনের কাহিনিকীর্তন। প্রতিটি আসরে রাসলীলা নামক কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে চলে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে কালিমা লেপন। শ্রোতারা ভেবে দেখেন না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকে লীলা সংবরণ পর্যন্ত প্রেম করার সময় পর্যন্ত পাননি। তাঁর জন্মই হয় কংসের কারাগারে। জন্মের পর পর পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর, কালীয়নাগের মতো অসুরদের দ্বারা প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছে রাজা কংস।

জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁকে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। পরবর্তীকালে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধের সময় কুরুক্ষেত্রে কেটেছে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে অধর্মের বিনাশ করে এসেছেন। পরবর্তীকালে তিনি সামাজিক ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সন্তানের পিতা হয়েছেন। দ্বারকার রাজা হয়েছেন। কোটি কোটি মানুষের তিনি অতি প্রিয় একজন আইকন। এর মাঝে তাঁর জীবনে রাধা এল কোথা থেকে? আমরা সকলে যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে থাকি তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। আত্মদর্শনকারী। ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। অধর্মের বিনাশকারী। যিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর কাছে পবিত্র ও চরিত্রবান একজন ত্যাগী পুরুষ। তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। গীতাতত্ত্ব দান করে প্রমাণ করে গেছেন আত্মা অবিনাশী। দেহের মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনে শ্রীরাধার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমরা জানি, একই নাম হাজার ব্যক্তির থাকতে পারে। হয়তো অন্য কোনো শ্রীকৃষ্ণ ছিল। যাকে এই বীর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, যাকে নিয়ে হরিবাসরে এত রসকীর্তন করা হয়। অধিকাংশ মানুষ নিজের জীবনযাত্রা যে ভাবে চলে, সেই চোখেই অন্যকে দেখতে ভালোবাসে। তাই হরিবাসরের মাধ্যমে তারা কামকীর্তন শুনতে ভালোবাসেন। রাসলীলার মধ্য দিয়ে রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অসত্যতা প্রচারে আনন্দ পান। তাঁকে দিয়ে গোপিনীদের কাপড় খোলান। শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত করান। ঠিক যেমন নিজেরা গোপনে করে থাকেন ঠিক সেই রকম আর কী।

আমরা যে বীর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে থাকি, তিনি ছিলেন ছোটো থেকেই একজন সংগঠক। যিনি বংশী বাজাতেন। গোরু চরাতেন। রাখাল বালকদের নিয়ে খেলতে খেলতে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সমাজ সংস্কারের জন্য, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াবার জন্য ধর্মরাজ্য স্থাপন করার জন্য। সেই শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকত শঙ্খ ও চক্র। মানুষের বিপদে দাঁড়াতেন বিপদতারণ হয়ে। তাই আমরা দেশে কোন শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালাবো? চোর চরিত্রহীন লম্পট শ্রীকৃষ্ণের? নাকি বীর, যোদ্ধা, সমাজ সংস্কারক, আত্মজ্ঞানী, রাজনীতি ও সমাজনীতিবিদ একজন পবিত্র চরিত্রযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের? সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে আপনার সন্তান এবং আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে।

—মানস বন্দ্যোপাধ্যায়,
জগমোহনপুর, হরিপুর, হুগলী।

প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে কি ভাঙতে চাইছেন আজকের মেয়েরা?

শুভশ্রী দাস

ফেসবুক ও অ্যাপেলের মতো ইনফরমেশন টেকনোলজিভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আমাদের কর্মরত মহিলাদের মাতৃত্বের সুখ বিলম্বিত করতে ওঠে পড়ে লেগেছে। তাদের 'এগস্ ফ্রিজিং' অর্থাৎ ডিম্বাণু সংরক্ষিত করার জন্য ২০ হাজার ডলার অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাংকে জমা করতে তারা রাজি হয়েছে। শুধু তাই নয়, ডিম্বাণু 'ব্যাংকে' রাখার খরচ বাবদ বছরে ৫০০ ডলার অর্থাৎ ৩০ হাজার টাকাও তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা রাখবে। কোম্পানিগুলির ভাবনা হচ্ছে, এর ফলে কর্মরত দক্ষ মহিলা টেকনিশিয়ানদের থেকে বেশি কাজ আদায় করা যাবে। অপরদিকে, মহিলারা পূর্ণভাবে কাজের দিকে মন দিতে পারবেন। এসবের জন্য মহিলা কর্মচারী তাদের গর্ভধারণ প্রক্রিয়া কয়েক বছর পরে করতে পারবেন। এভাবেই মহিলাদের জীবনচক্র বদলে ফেলা হচ্ছে। ফেসবুকে প্রচার শুরু হয়ে গেছে আর অ্যাপেল আগামী বছরের মধ্যেই চালু করবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও তার ব্যবসায়িক উপযোগকারীরা (কিছু ব্যতিক্রম) স্ত্রী-পুরুষ সমানতার কথা যতই বলুক তারা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং সফলতাও পাচ্ছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, সারোগেসি, কৃত্রিম গর্ভাধান প্রক্রিয়া মূর্ত করার পর এখন এগস্ ফ্রিজিংকে ব্যবসায়িক স্বরূপ প্রদান করতে যাওয়াই এর প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। একদিকে সারা পৃথিবীতে মাতৃত্বের অবকাশ ৬ থেকে বাড়িয়ে ৯ মাস করার দাবি উঠছে, অফিসে বেবি সিটিং বা দোলনা রাখার দাবি ও শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য কাজের ফাঁকে ১ ঘণ্টা ছুটির দাবি উঠছে। অন্যদিকে, কোম্পানিগুলি এসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে মহিলাদের স্বাভাবিকভাবে মা না হওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। সর্বজনস্বীকৃত সত্য হলো, স্বাভাবিকভাবেই ২৭ বছর বয়সেই মেয়েদের ডিম্বাণু পুষ্ট হয়। তারপর গুণগতভাবে হ্রাস ঘটে। ভারত-সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ক্যারিয়ারের নামে মাতৃত্বের বয়স বাড়ানো হচ্ছে। এর পরিণামে প্রসূতি সম্পর্কিত জটিলতা ভারতে বহুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে।

তথাকথিত পশ্চিমি খোলা সমাজও মহিলাদের নিয়ে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয়। ফেসবুকের মতো সংস্থাগুলিতে মহিলাদের নিয়ে উপহাস করার জন্য 'ফ্রেট হাউস কালচার' (প্রজনন সংক্রান্ত সংস্কৃতি) ও 'বয়েজ ক্লাব' সক্রিয় রয়েছে। আমেরিকাতে ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়সে মা হওয়া মহিলার সংখ্যা গত ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে— এই নতুন তথ্যের বিষয়ে সিনিয়র তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুস্মিতা বলেন— এটা খুবই ভুল তথ্য যে, তথ্যপ্রযুক্তি-তে কাজ করা মহিলারা মাতৃত্বের দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁর মতে— আমেরিকাতেও মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি মা হতে চান যাতে তাঁর সন্তান স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান হয়। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনোর ব্যাপারেও পুরো মনোযোগ দিতে চান। কেননা আমেরিকাতে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ-পরীক্ষা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। ভারতেও মহিলারা সকাল ৮টায় কাজে আসার আগে সন্তানের দেখভাল করেন। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি-তে কাজ করা মহিলারা শুধু সন্তানের জন্য নয়, স্বামীর জন্যও ছুটি নিতে সঙ্কোচ করেন না। সারা পৃথিবীর মেয়েরা এ বিষয়ে কম-বেশি একইরকম। ব্যতিক্রম সব জায়গায় থাকে। নেতিবাচক তথ্যগুলিও হাতে গোনা মহিলা-প্রফেশনালদের নিয়ে তৈরি করা।

বস্তুতপক্ষে এ বিষয়টি কোনো বিশেষ শিল্প বা চাকুরিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা সেই বিপজ্জনক ভাবনার পরিণাম যা মানুষকে এক সংবেদনহীন জীবন্ত কিছুতে পরিবর্তিত করতে চায়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন যে, পরিবার নামক মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করে দেওয়াই এই ব্যবসায়িক জগতের আসল উদ্দেশ্য। অত্যধিক উৎপাদনকে অন্তহীন উৎপাদনে পৌঁছনোর জন্য তাঁদের বিবেকহীন কর্মচারী ও উপভোক্তার প্রয়োজন পড়ে। এভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই মজবুত করা হচ্ছে।

মাতৃত্বের ফলে পেশাদারি মহিলাদের জীবনে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। এ বিষয়ে মতামত জানাতে পুরুষরা চুপ থাকতে ভালোবাসেন। বরং তাঁরা মনে করেন কেবল মহিলাদেরই দায়িত্ব সন্তান মানুষ করার। নারীস্বাধীনতা বা মাতৃত্ব নিয়ে তাঁদের সমবেদনা এই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ নয় তো? ক্যারিয়ারের দোহাই দেওয়া মহিলাদের সামনে মুষ্টিযোদ্ধা মেরি কমের উদাহরণ তো সবারই জানা। সন্তান হলে ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে— এটা তো ধোপে টিকছে না! তিনি দু'টি সন্তান হওয়ার পর অলিম্পিকে ব্রোঞ্জপদক এবং তৃতীয় সন্তান হওয়ার পর এশিয়াডে স্বর্ণপদক জিতেছেন। সুতরাং, মাতৃত্বকে অযথা বিলম্বিত করা প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে ভাঙা নয়? ■

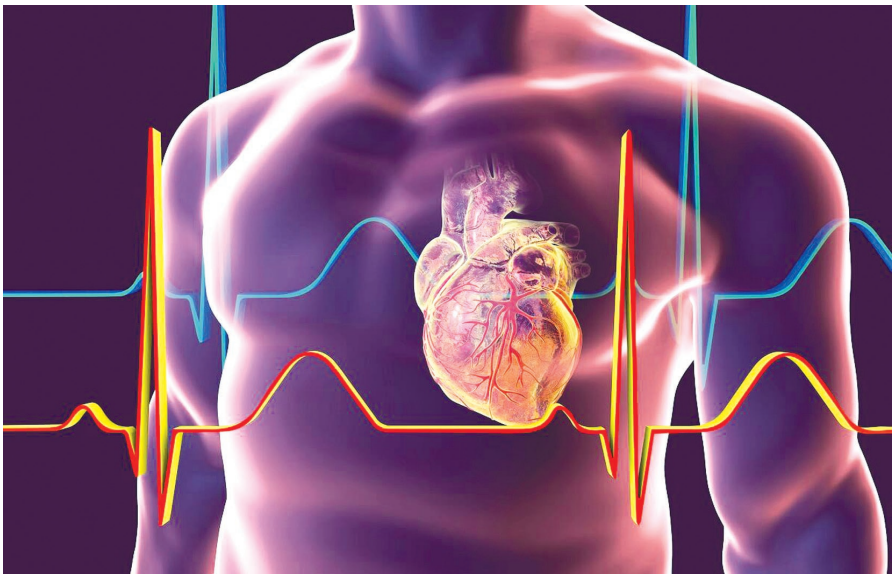

আচমকা হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে করণীয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর বড়ো ১০টি কারণের অন্যতম হার্ট অ্যাটাক বলা হয়ে থাকে। বিশ্বে এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ। আমাদের দেশেও হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ আজকাল খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ব্যায়াম করুন আর নাই করুন, যে কোনো সময়ে আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করুন এবং এতে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ২০০-র নীচে রাখতে সচেষ্ট হন। তুলনামূলক বেশিমাত্রায় খারাপ কোলেস্টেরল বা এলডিএল অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ ট্রাইগ্লিসারাইড এই সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং এটি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সমান ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও হার্ট অ্যাটাক হলেই মৃত্যু হবে এমন নয়। শক্তিশালী ক্লটবাস্টিং (রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধকারী) ওষুধ বেশিরভাগ হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারে।

এই ওষুধ দ্রুত সরবরাহের মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ ধমনিতে জমাট বাঁধা রক্ত তরলীকরণের মাধ্যমে প্রতিবছর হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ ডাব্লিউ ডগলাস ওয়েভার বলেন, একজন চিকিৎসক কোনো রোগীর ক্লট বাস্টিং চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা তা তাকে অধিকসংখ্যক প্রশ্ন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তিনি এই সত্য প্রমাণে সক্ষম হবেন যে, রোগীর চিকিৎসা না করার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে এই ওষুধ ব্যবহারের ঝুঁকি নেওয়া অনেকাংশেই উত্তম। কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ও পরিচালক রবার্ট গিন্সবার্গ স্বীকার করেন, ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যত ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত তা হচ্ছে না।

সবচেয়ে ভালো হবে হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেওয়ার প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই যদি রোগীকে ক্লট বাস্টার দেওয়া হয় তবে মৃত্যুঝুঁকি ৪৭ শতাংশ কমে যায়। আবার ৩ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে এই ঝুঁকি কমে যায় ১৭ শতাংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লট বাস্টিং ওষুধগুলোর মধ্যে কোনটি আপনি দ্রুত নাগালের মধ্যে পেলেন।

সর্বোত্তম হাসপাতালটি বেছে নিন : হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে হাসপাতালে আনা এবং ক্লট বাস্টিং ওষুধ প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়সীমা ৩০ মিনিট (যা রোগীর জন্য ভালো) থেকে ২৫৫ মিনিট (যা রোগীর জীবননাশে যথেষ্ট) পর্যন্ত বিস্তৃত। হাসপাতালের এই জরুরি বিভাগগুলি খুব ভালো যেখানে রোগী পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিহত করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যদি আপনার এলাকায় চিকিৎসার জন্য একাধিক হাসপাতাল থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিন, হার্ট অ্যাটাক চিকিৎসার জন্য কোনটি উত্তম।

প্রাথমিক উপসর্গ

—বুক ব্যথা, চাপ চাপ ব্যথা, বুকের বাম পাশে বা পুরো বুকজুড়ে তীব্র ব্যথা।

—শরীরের অন্য অংশে ব্যথা মনে হতে পারে, ব্যথা শরীরে এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলে যাচ্ছে যেমন বুক থেকে হাতে ব্যথা অনুভব করা। সাধারণত বাম হাতে ব্যথা হয় কিন্তু দু'হাতেই ব্যথা হতে পারে।

—মাথা ঘোরা বা ঝিমঝিম করা।

—শরীরে ঘাম হওয়া।

—বমি বমি ভাব হওয়া।

—বুক ধড়ফড় করা বা বিনা কারণে অস্থির লাগা।

—সর্দি বা কাশি হওয়া।

বেশিরভাগ সময় বুকে ব্যথা খুবই তীব্র হয়, ফলে শরীরের অন্য অংশে ব্যথা অনেকেই টের পান না। ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের এক গবেষণা বলছে, হৃদরোগের প্রাথমিক উপসর্গ খেয়াল না করলে তার ফলে কেবল মৃত্যু নয়, বেঁচে থাকলেও অনেক জটিলতা নিয়ে বাঁচতে হয়।

সবসময় মেডিকেল তথ্যসংবলিত প্রয়োজনীয় তালিকা সঙ্গে রাখুন : এটি সঙ্গে থাকলে যে কোনো জরুরি বিভাগে খুব ভালো কাজ দেবে। আমেরিকার বার্মিংহামের অ্যালবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের পরিচালক ডাঃ জেরাল্ড পস্ট আপনার চিকিৎসককে জানানোর জন্য আপনার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে আপনার মানিব্যাগে সব সময় রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় কিন্তু এখনই। মনে রাখবেন, আপনার হার্ট অ্যাটাকের পরে প্রতিটি সেকেন্ড আপনার বাঁচার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করতে থাকে। □

অটলবিহারীর অবদান চিরন্তন ও অটল

শেখর সেনগুপ্ত

যুগপৎ ইতিহাস ও অর্থনীতিকে চর্চায় না আনতে পারায় আমি বিমর্ষ। আবার সাহিত্যকে নিয়ে যখন সাঁতারের চেষ্টায়, তখন তাড়াতাড়ি যাঁর অবদান ও স্মৃতি আমার কলমকে শক্তি জোগায়, তিনি একমেবদ্বিতীয়ম অটল বিহারী বাজপেয়ী। অতবড়ো হৃদয়বান নেতা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আজ অবধি খুঁজে পাইনি। তিনি সেই প্রধানমন্ত্রী, যিনি হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও একজন অতি নগণ্য ব্যক্তিরও ব্যক্তিগত অবদান একাগ্রতার সঙ্গে শুনতেন এবং তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন সহায়তার জন্য। আর আমি মুগ্ধ তাঁর সাহিত্যভাত লেখনীর প্রাণপ্রাচুর্যে। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু তরুণ বিজয় লিখেছেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা করায় কোনও মানুষেরই বাধা ছিল না। যে কেউ অবাধে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের কথা জাগতে পারতেন। যদি সেই বায়নায় কোনও অপরাধ বা প্রতিহিংসার ছায়া থাকতো, তিনি সরাসরি তাঁকে সংযত ও সহনশীল হবার পরামর্শ দিতেন।'

অটলবিহারী যখন পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন পাঠকরা বুঝতে পারেন, তাঁর হৃদয় কত বড়ো। যিনি বার বার পত্রিকাকর্মীদের বলতেন, 'সংযম, শালীনতা ও উদারতা যাঁর নেই, তিনি কখনও কোনও পত্র-পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক হতে পারেন না। ...মনে রাখবেন, হিন্দুত্ব মানে ধর্মান্ধতা নয়। ধর্মের নামে কট্টরতা আদতে নিজের ধর্মকেই অপমান করা।' আবার দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে অটলজীর প্রয়াস ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ণ। কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের মেরুদণ্ডকে তিনি দুর্বল করে দেন; আবার আগ্রার শিখর সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের যুদ্ধপ্রিয়তাকে ত্যাগ করে বন্ধুদেশ হয়ে ওঠার জন্য আবেদনও জানান।

অটলবিহারী বলেছিলেন, 'ভারতীয় সভ্যতা কালজয়ী। আমাদের পার্থিব জীবন আদর্শময়। সূক্ষ্মজীবনবোধকে অবলম্বন করুন। এই বোধকে ত্যাগ করেছিল বলেই রোম ও গ্রিসের শিক্ষা ও গৌরব আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে বললেন, 'অটলজী স্বাধীন ভারতে বিশিষ্টতম দেশনায়ক। তাঁর জন্মদিনকে আমরা 'সুশাসন দিবস' রূপে পালন করতে চাই। অতবড়ো সুশাসক আমরা আমাদের অতীতে প্রত্যক্ষ করিনি। ভবিষ্যতেও করবো কিনা, সন্দেহ। তিনি বলতেন, 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রচনা অমানুষরাই করে থাকে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান— এই তিনি মৌলিক চাহিদা মেটাতেই হবে দেশের সরকারকে।'

অটলবিহারীর মূল্যায়ন করবার সময় আমাদের অবশ্যই স্মরণে আনতে হবে ১৯৭৫ সালের জারি-করা ঘৃণ্য জরুরি অবস্থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর অমন নারকীয় আঘাতের কথা ভারতবাসী কোনওদিন ভুলতে পারবে না, ক্ষমাও করবে না। সেই কালবেলায় জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অটলবিহারী ভারতজুড়ে যে আন্দোলন সংঘটিত করেন, আমাদের তা কোনওদিন ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর অনাবিল প্রয়াসে ভারতীয় জনসঙ্ঘ দল মিশে যায় জনতাপার্টির সঙ্গে। এবং তৎপরে নির্বাচনে বিধ্বস্ত হয় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস। অটলবিহারী বাজপেয়ী তিন-তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। একবার হয়েছিলেন তেরো দিনের জন্য, দ্বিতীয়বার তেরো মাসের জন্য এবং শেষবার চার বছর ছ' মাসের জন্য। জোট সরকার চালাতে গেলে যে দক্ষতা ও মানসিকতার দরকার, অটলজী তার প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁর তৈরি জোটে ছিল বাইশটি রাজনৈতিক দল, যাদের একটির নেতৃত্বে ছিলেন জয়ললিতার মতো মহিলাও। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর একান্ত অনুগামিনী। অটলজী আর নেই শুনে অতীব কাতরতার সঙ্গে মমতা বলেছিলেন, 'উনি আর নেই শুনে আমি বড়োই মর্মাহত। অটলজীকে নিয়ে আমার স্মৃতি অতি মূল্যবান ও শিক্ষণীয়। আমাদের সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। আমি তাই সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে যাচ্ছি দিল্লিতে।'

১৯৭২ সালে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান সম্পর্কে অটলজী বলেছিলেন : আমার একটা স্বপ্ন আছে। তাহলো প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থাকা। আমার দেশের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে হবে। তিনিই তো ছিলেন ভারতের প্রথম স্বয়ংসেবক প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ অবধি তিনি তাঁর আদর্শগত আলো জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছিলেন নয়াদিল্লিতে। সেই আলো কিন্তু এখন ভারত ব্যাপী আরও বেশি উজ্জ্বল।

অতল যাহার দেশপ্রেম, তিনিই অটলবিহারী

শিলাদিত্য ঘোষ

দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে গাড়ি চলছে। গতি বাড়ছে। বয়স হয়েছে রাস্তাটার। অনেকবার এসেছি। আর প্রতিবার এই রাস্তায় এলেই একটা নাম মনে পড়ে। তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ী। 'পদ্মবিভূষণ', 'ভারতরত্ন' এমন অনেক পালক তাঁর মুকুটে রয়েছে তবু এই রাস্তাটায় এলেই আমার মনে হয় তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রধান রূপকারদের অন্যতম। অতল দেশপ্রেমের অধিকারী অটলবিহারীই তো প্রথম বুঝেছিলেন উন্নয়নের যাত্রাপথ সুগম করতে চাই দেশের সব প্রান্তকে সড়ক সূত্রে বেঁধে ফেলা। আবার তিনিই সাহস দেখিয়েছিলেন গোটা বিশ্বের চমকানি অগ্রাহ্য করে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণের কথা। আগাম কেউ জানতে পারেনি সে কথা। কিন্তু পরের দিন গোটা দেশের মানুষ সগর্বে বলেছে, 'আমাদের হাতে এখন পরমাণু বোমা।' বিশ্বকে অন্য ভারত চিনিয়েছেন তো তিনিই। আবার পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা যিনি বার বার দিয়েছেন তিনিই কার্গিলে অনুপ্রবেশের পরে পালটা আক্রমণের নির্দেশ দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেননি। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক রত্ন ছিলেন।

ওঁর জন্য বিশেষণের অভাব হয় না। 'স্বপ্নদ্রষ্টা' তো তাঁকেই বলা যায়। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে বিকশিত ভারত, বিশ্বের সামনে গর্ব করে দেখানোর মতো ভারত, তার বীজবপন হয়েছিল অটলবিহারীর হাতেই। মাঝের অচলাবস্থা কাটিয়ে বাজপেয়ীজীর অপূর্ণ কাজই তো ভারত আবার শুরু করেছে ২০১৪ সাল থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আর এক 'রত্ন' বর্তমানে দেশের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

শুরুটা করেছিলাম রাস্তার কথা দিয়ে। ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী যখন এই সড়ক-স্বপ্ন দেখছেন তখন গোটা দেশে রেল যোগাযোগ থাকলেও পণ্য পরিবহণের সুগম সড়ক ছিল না যা গোটা দেশকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে। ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী 'স্বর্ণ চতুর্ভুজ' নামে এক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ৫,৮৪৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই পথ ভারতের বৃহত্তম মহাসড়ক এবং বিশ্বের পঞ্চম। যে পথ দেশের বেশিরভাগ শিল্প, কৃষি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে সংযুক্ত করেছে। দেশের চারটি প্রধান মহানগর, দিল্লি (উত্তর), কলকাতা (পূর্ব), মুম্বই (পশ্চিম) এবং চেন্নাই (দক্ষিণ)-কে ছুঁয়ে গিয়ে একটি চতুর্ভুজ গঠন করেছে। অর্থনীতিবিদরাও মানেন ভারতের আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল ওই পথ ধরেই।

ভারতের উন্নয়নের জন্যই যেন তাঁর জন্ম। জন্মদিনটিও মনে রাখার মতো। অটলবিহারীর জন্ম ১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র শহরে। মা কৃষ্ণাদেবী, বাবা কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী। বাবা ছিলেন কবি, পেশায় স্কুলশিক্ষক। অটলবিহারীর কবিতায় হাতেখড়ি বাবার কাছেই। গোয়ালিয়রের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে কানপুরের ডিএভি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ হন প্রথম শ্রেণীতে। ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত— বেশ তরুণ বয়সেই তিনটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন বাজপেয়ী। ছোটোবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে প্রাণিত ছিলেন তিনি।

রাজনীতি বোধহয় ছিল তাঁর মজ্জায়। ছাত্রাবস্থাতেই 'আর্যসমাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। বাবাসাহেব আপ্তের অনুপ্রেরণায় ১৯৩১ সালে যোগ দেন সঙ্ঘকাজে। কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ে ওঠেন সঙ্ঘের প্রচারক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগ দিয়েছিলেন অটলবিহারী। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জেল খেটেছিলেন ২৩ দিন। এর পরে রাজনীতি। অকৃতদার বাজপেয়ী ছিলেন পূর্ণ সময়ের রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৫১ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি যোগ দেন ভারতীয় জনসঙ্ঘে। দলের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয়পাত্রও হয়ে ওঠেন শীঘ্রই। ১৯৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর থেকে বাজপেয়ী প্রথমবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি হন। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান। ইন্দিরা-বিরোধী ঐক্য জোরদার করতে চরণ সিংহের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় লোকদল, মোরারজি দেশাইয়ের কংগ্রেস (ও) এবং বাজপেয়ী-আদবাণীদের জনসঙ্ঘ মিশে যায়, তৈরি হয় জনতা পার্টি। নির্বাচনে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। মোরারজি দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে দেশে প্রথম অকংগ্রেসি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অটলবিহারী বাজপেয়ী সে মন্ত্রীসভায় বিদেশমন্ত্রী হন।

১৯৯৬ সালে লোকসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি। দেশের দশম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অটলবিহারী। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না দলের। ম্যাজিক ফিগার জোগাড়ও করতে পারেননি বাজপেয়ী। ১৩ দিনে পতন ঘটে বাজপেয়ী সরকারের। কিন্তু ইস্তফা দেওয়ার আগে যে ভাষণ অটলবিহারী দিয়েছিলেন লোকসভায়, তা সংসদে প্রধানমন্ত্রীদের দেওয়া স্মরণীয় ভাষণগুলোর অন্যতম হয়ে রয়ে গিয়েছে।

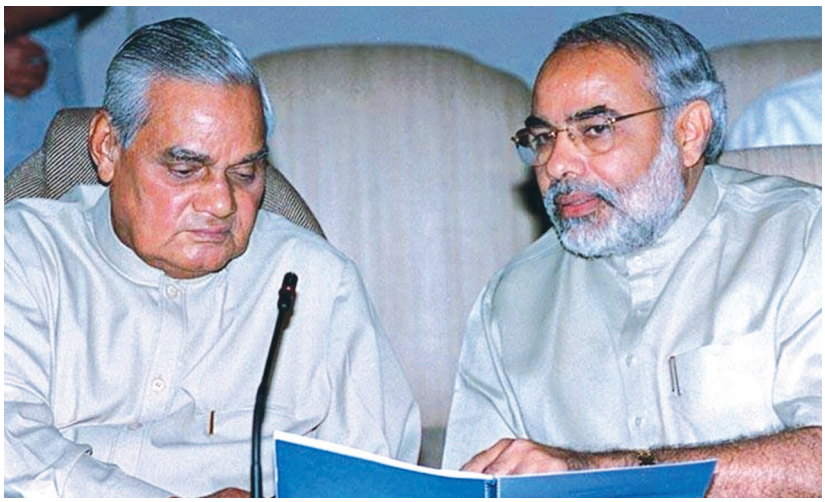

বাজপেয়ী সরকার টেকেনি ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে তৈরি হওয়া সংযুক্ত মোর্চা সরকারও বছর দু'য়েকের বেশি টিকতে পারেনি। ফলে ১৯৯৮ সালে ফের নির্বাচনের মুখোমুখি হয় দেশ। আরও বেশি আসন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি। ফের সরকার গঠন করে এনডিএ। কিন্তু সে বারও পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে পারেননি বাজপেয়ী। তেরো মাসে সরকার পড়ে যায়। ১৯৯৯ সালের নির্বাচনের রায়ও ছিল বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের পক্ষেই। তৃতীয়বার সুযোগ পেয়ে প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড গড়েন বাজপেয়ী।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় কার্যকালে অটলবিহারী বাজপেয়ী অনেকগুলি ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছিল। রাজকোষ দ্রুত ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। দেশ জুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন গতি পেয়েছিল। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক হিংসা-সহ নানা বিষয় ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আর এনডিএ-কে ক্ষমতায় ফিরতে দেয়নি। পরাজয়ের সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিয়ে বিরোধী নেতার পদ নেওয়া থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে আর নির্বাচনেও লড়েননি। মতাদর্শগত দিক থেকে বাজপেয়ীর চেয়ে অনেকটা দূরত্বে অবস্থান করা মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ী হলেন ভারতীয় রাজনীতির ভীষ্ম।'

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পরে লখনউয়ে আইন পড়তেও শুরু করেছিলেন। কিন্তু পাঞ্চজন্য পত্রিকা সম্পাদনার ডাক পেয়ে পড়ায় ইতি টানেন। কবিতা লেখার শখও তখন থেকেই। 'হার নেহি মানুঙ্গা' কবিতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রবাদীদের মনের জেদ ঠিক কেমন হওয়া দরকার। তাঁর বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি সত্যিই নাড়া দিয়ে যায়। অটলবিহারীই তো লিখেছিলেন—

'ভারত জমীন কা টুকরা নহীঁ
জিতা জাগতা রাষ্ট্রপুরুষ হ্যায়
ইসকা কংকর-কংকর শঙ্কর হ্যায়।
ইসকা বিন্দু বিন্দু গঙ্গাজল হ্যায়।
হম জিয়েঙ্গে তো ইসকে লিয়ে
মরেঙ্গে তো ইসকে লিয়ে।'

তবে কবিতার থেকেও বেশি করে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। বাজপেয়ী ভারতীয় রাজনীতির একটা স্বর্ণযুগের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে নতুন ভারত, প্রগতির ভারত, উদীয়মান ভারত গড়ে তোলার জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর গোটা জীবন সমর্পিত ছিল আদর্শের প্রতি, নৈতিকতার প্রতি, বিবেকের প্রতি। ব্যক্তির থেকে রাষ্ট্র যে বড়ো তা তো বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

সেই সময়টা ছিল অন্যরকম। সদ্য স্বাধীন ভারতে সদর্পে উড্ডীন ছিল কংগ্রেসের পতাকা। অন্যদিকে, ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল বামপন্থীরা। এই দুই ধারার বাইরে আরও একটা ধারা ভারতীয় রাজনীতিতে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে শুরু করেছিল সে সময়ে। দেশপ্রেমের সেই ধারাকে অনেকে হিন্দুত্ববাদী ধারা বলেও অভিধা দেন। সে ধারার প্রবাহ স্বাধীনতার আগেই ছিল। ১৯২৫ সালেই ডাঃ কেশব বলিরাম রাও হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থাপনা করেছেন। স্বাধীন ভারতে আরও সশক্ত অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সঙ্ঘ। আজও যা অব্যাহত। সাফল্য অনেক পরে এসেছে। কিন্তু প্রায় গোড়া থেকেই ভারতীয় রাজনীতির হিন্দুত্ববাদী ধারার কয়েকজন মহীরূহ-প্রমাণ ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। বাজপেয়ীজী তাঁদেরই অন্যতম।

একটা সময়ে যখন দেশের রাজনীতিতে টালমাটাল হয়, গোটা দেশে

যখন অনুভূত হচ্ছে নেতৃত্বের শূন্যতা, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্বল করে যখন দিকে দিকে আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান হচ্ছে, তখন অটলবিহারী বাজপেয়ীতেই আস্থা রেখেছিল ভারত। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘরানার ভিন্ন ভিন্ন মতামতের একগুচ্ছ রাজনৈতিক দল, তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশা, কোথাও কোথাও পরস্পর বিরোধিতাও ছিল। কিন্তু সবাই একমত হয়ে সেদিন নেতা মেনেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীকে। এক স্বয়ংসেবকের মধ্যেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন খুঁজেছিলেন সকলে। তিনিও দেশকে, দেশবাসীকে হতাশ করেননি।

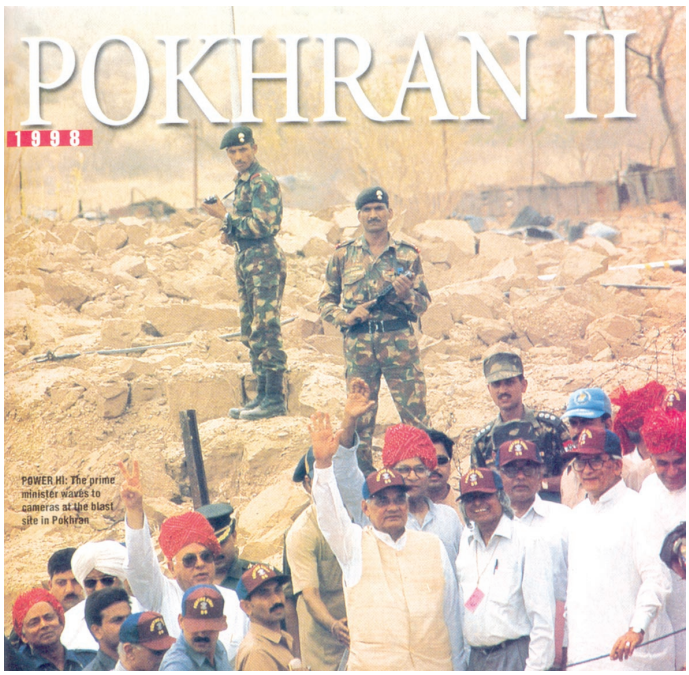

ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে অন্যায় বলার ক্ষমতা তিনি আজন্ম লালন পালন করেছিলেন। সেই কোন ১৯৭১ সালে সংসদে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোর প্রতিপক্ষ ইন্দিরা গান্ধীকে পূর্ণ সমর্থন দিতে দ্বিধা করেননি। আবার ২০০২ সালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'রাজধর্মের' কথা বলতেও পিছপা হননি। প্রকৃত শিষ্যের মতো সেই 'রাজধর্ম' রক্ষাও করেছিলেন মোদী।

রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরেও তিনি সমর্থ ভারতেরই স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু যেদিন সময়ের নিয়মে চলে যেতে হয়েছিল সেদিন তিনি দেখে যেতে পেরেছেন তাঁর স্বপ্নের সাফল্য। দেখে গিয়েছেন তাঁর হাতে তৈরি দল একক শক্তিতে ভারতের দায়িত্ব সামলাচ্ছে। সেই সময়ে কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'উনি ছিলেন সর্বার্থে প্রকৃত বিরোধী নেতা। প্রবল গণ্ডগোল পাকিয়ে সংসদ বানচাল করার রেওয়াজ তখন এমনিতেও ছিল না। বারবার আমি বলেছি যে এটা সংসদীয় কানুনের মধ্যে পড়ে না। বাজপেয়ীও সেটাই বিশ্বাস করতেন। ভাষার উপর অসামান্য দখল ছিল তাঁর। এরকম বাগ্মী বক্তার অধিবেশনে বিরোধিতা করার জন্য গণ্ডগোল পাকানোর দরকারও হতো না। যুক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি নিজের বক্তব্য প্রকাশ অথবা বিপক্ষের অবস্থানকে খণ্ডন করতে পারতেন। সংখ্যা তাঁর পক্ষে থাক বা না থাক, তিনিই ছিলেন আমার চোখে দেখা সেরা বিরোধী নেতা।' ওই লেখাতেই প্রণববাবু আরও বলেন, 'আশির দশকে অনেকবার তাঁর সঙ্গে সংসদে বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছে আমার, নয়ের দশকেও হয়েছে। সেই যুদ্ধেও যেন একটা আনন্দ ছিল।'

তবে বাজপেয়ী সম্পর্কে কিছু বলার সবচেয়ে বড়ো অধিকারী অবশ্যই লালকৃষ্ণ আদবাণী। তিনি বিভিন্ন লেখায় নানা কাহিনি শুনিয়েছেন এই প্রজন্মকে। একটি লেখায় আদবাণীজী বলেন, 'সেদিন ভোটের ফল বেরিয়েছে। ফল খুব খারাপ হয়েছিল দলের। আমরা মনের দুঃখে পাহাড়গঞ্জের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। খুব মন খারাপ। তখন পাহাড়গঞ্জে একটি সিনেমা হল ছিল। তাতে রাজকাপুরের সিনেমা 'ফির সুবহ হোগী' চলছিল। ছবির নাম দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ঠিক করলাম, আপাতত মনের দুঃখ কাটাতে ওই সিনেমাটা দেখা যাক। বিজেপিরও নিশ্চয় অন্ধকার কেটে সকাল আসবে।'

ছ' বছর বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী আর আদবাণীজী উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়ের কাহিনি বলতে গিয়ে লালকৃষ্ণ আদবাণী লিখেছেন, 'তাঁর সঙ্গে ছ' বছর কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি নেতা হতে গেলে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন। কী অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। আমি চেষ্টা করেও তাঁর মতো বাগ্মী হতে পারিনি। প্রতিপক্ষের মন জয় করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁদের সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও সেটিকে তিনি কখনওই বড়ো করে দেখেননি। বরং সব সময় চেষ্টা করেছেন, যাতে সেই মতপার্থক্য ঘুচিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকে জানেন না অটলজীর একটি অদ্ভুত গুণ ছিল। আমি যদি কোনও প্রস্তাব দিতাম তা হলে তিনি কোনওদিনই তাতে 'না' বলতেন না। আর 'না' বলতেন না বলেই আমার ওপর চাপ বেড়ে গিয়েছিল। কোনও কিছু বলার আগে বারবার ভাবতাম— এটা আমার বলা ঠিক হচ্ছে তো!'

বিজেপিতে বাজপেয়ীজী ছিলেন সকলের নেতা। তাঁকে কখনও দলের কর্মীরা ভয় পেতেন না। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনও ক্ষমতার প্রতি তাঁর লোভ দেখা যায়নি। অথচ একবার সেই অপবাদই শুনতে হয়েছিল। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। আস্থা ভোটের আগে লোকসভায় এক অবিস্মরণীয় ভাষণ দিলেন। আজও সেই ভাষণ বহু মানুষ বার বার শোনেন। বলেছিলেন, 'সত্তা তো খেলতে চলেগা, সরকার আয়েঙ্গে, জায়েঙ্গে, পার্টিয়াঁ বনেগি, বিগড়েগি, মগর ইহ দেশ রহনা চাহিয়ে, দেশ কা লোকতন্ত্র অমর রহনা চাহিয়ে।' বলেছিলেন, 'আমি মরতে ভয় পাই না, ভয় পাই শুধুমাত্র বদনামের।' এর পরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টাটুকু না করে গট গট করে হেঁটে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র দিতে চলে যান।

একবার তাঁর কাব্যচর্চাকে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের তৎকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন, 'শুধু কবিতা লিখলে দেশ চলে না।' একটুও মেজাজ না হারিয়ে ততোধিক তীক্ষ্ণ শ্লেষে অটলবিহারী বলেছিলেন, 'ঠিকই, শুধু কবিতা লিখলে দেশ চলে না, লিখে রাখা ভাষণ জনসভায় গিয়ে পড়লে দেশ দৌড়য়।' উল্লেখ্য, সেই সময়ে সোনিয়া গান্ধী অন্যের লেখা ভাষণই কোনওক্রমে পড়তেন।

রাজনীতির মতো কূটনীতিতেও ভারসাম্যের পরিচয় দেখিয়েছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে বড়োসড়ো পদক্ষেপ করেছিল ভারত। তৎকালীন

পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে সঙ্গে নিয়ে ভারত-পাক বাসযাত্রার সূচনা করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'বন্ধু বদলানো যায়। কিন্তু প্রতিবেশী বদলানো যায় না।' কিন্তু কার্গিলে পাক অনুপ্রবেশ ও দখলদারির খবর পেয়েই সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেননি তিনি।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায় ভারত। তাতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয় দেশকে। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে ভারতের অভূতপূর্ব সুসম্পর্কের দরজাটাও খুলে দিয়ে যান তিনিই। তাঁর আমলেই ভারত সফরে আসেন মার্কিন প্রসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন। ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন যুগের সূচনা হয়ে যায় ক্লিন্টনের সেই ভারত সফরেই।

সঙ্ঘের যোজনায় ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগ দেন বাজপেয়ী। দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ যখন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাশ্মীর অভিযান করেন, তখন অন্য দুই প্রবীণ সহযোগীর সঙ্গে বাজপেয়ীও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। কাশ্মীরে প্রবেশের মুখে গ্রেপ্তারি অনিবার্য জেনে শ্যামাপ্রসাদ এই তরুণ সচিবকেই সঙ্গে নেন, যিনি তাঁর বৌদ্ধিক সহযোগী ও পরামর্শদাতা হওয়ার যোগ্য। শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াণের পর তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন। ১৯৫৭ সালেই তিনি জনসঙ্ঘের সভাপতি। নির্বাচিত হলেন লোকসভাতেও। শুরু হয় পাঁচ দশকেরও বেশি দীর্ঘ সাংসদ (ছ'বার লোকসভার এবং দু'বার রাজ্যসভায়) জীবন।

প্রথমবার যখন বাজপেয়ী লোকসভায় যান, প্রধানমন্ত্রী সে সময় জওহরলাল নেহরু। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও নেহরু মুগ্ধ হয়ে অটলজীর বক্তৃতা শুনতেন। কখনও কোনও লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেননি বাজপেয়ী। তাঁর বক্তৃতা ছিল শ্রুতিসুখকর, উর্দু ও ফারসি-বহুল আলংকারিক হিন্দি এবং নাটকীয় অঙ্গভঙ্গিতে ভরা। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁর হিন্দি ভাষণ দুনিয়ার নজর কাড়ে। তার আগে, ইন্দিরা গান্ধীর সময়েই সংসদে বিরোধী নেতা হিসেবে বাজপেয়ীর প্রসিদ্ধি। জরুরি অবস্থা পার হয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের 'জনতা বিপ্লব'-এর পথ বেয়ে তিনি জনতা সরকারের বিদেশমন্ত্রী। সেই থেকে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র।

১৯৮০ সালে বাজপেয়ীর পৌরোহিত্যেই ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম। তার চার বছর পরে পদ্মবিভূষণ (১৯৯২) এবং ভারতরত্ন (২০১৫) বাজপেয়ীর দল বিজেপি মাত্র দুটি আসনে জয় পায়। সংসদে অন্য দলের সদস্যরা হাসাহাসি করতেন। সেই সময়ে সংসদে দাঁড়িয়ে বাজপেয়ী তাঁদের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, 'আজ আপনারা যে দলের সংখ্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছেন, একদিন সংখ্যার অমোঘ সত্যে তারই বিপ্রতীপ আপনাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' ২০১৪ সালে ২৮২টি আসন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে পেয়েছে ৩০৩টি আসন। তারাই এখন দেশ পরিচালনা করছে। ২০২৪ সালে তাদের লক্ষ্য এককভাবে ৪০০ অতিক্রম।

বাজপেয়ী ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ

অমিত কুমার চৌধুরী

ভারতের রাজনীতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ী এক সর্বজনগ্রাহ্য, উদার, প্রখর জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন যিনি সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি দূরে রেখে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাই বিরোধী নেতা হয়েও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

১৯৭৭ সালে প্রথম কেন্দ্রে এক অকংগ্রেসি জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন বাজপেয়ী। তিনিই এদেশের প্রথম রাজনৈতিক নেতা, যিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় হিন্দিতে ভাষণ প্রদান করে স্বাভিমানবোধের পরিচয় দিয়ে দেশের সম্মান বাড়িয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমরা আমাদের ইতিহাস পালটাতে পারি কিন্তু ভূগোল নয়। তাই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্কের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে দুই বছরের স্বল্প সময়ে। চীনের সঙ্গেও সেই চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি।

ভারতের বিদেশ নীতি প্রকৃতপক্ষে জোট নিরপেক্ষ নীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশ্ব দুই মুখ্য ধারায় বিভাজিত হয়। আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো ভুক্ত দেশ সমূহ, অপর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট জোট। কিন্তু ভারতের নীতি ছিল জোটনিরপেক্ষ। আমেরিকা বরাবর পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া বরাবর ভারতের পক্ষে থাকলেও অন্ধের মতো রাশিয়াকে বাজপেয়ীজী সমর্থন করেননি। আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির সময় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশ আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতাপার্টির সরকার স্থাপিত হলে বাজপেয়ীজীর বিদেশমন্ত্রিত্বে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।

১৯৭৯ সালে জনতা পার্টির পতনের পর পুনরায় কংগ্রেসি শাসন শুরু হয়। কিন্তু জনতা পার্টিতে বিলীন হওয়া জনসঙ্ঘ ভারতের রাজনীতিতে পুনরায় ভারতীয় জনতা পার্টি নামে এক শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে খুব দ্রুত ভারতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপে উঠে আসে। ইন্দিরা গান্ধীর দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু রাজীব গান্ধীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর পিভি নরসিমা রাও দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিরোধীনেতা বাজপেয়ীকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠিয়ে এক উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বাজপেয়ীও কংগ্রেসি সরকারের সমালোচনা না করে দেশের স্বার্থে ভারতের হয়ে কথা বলে প্রকৃত দেশভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ হিউম্যান রাইটস্ কমিশনে কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তান ভারত বিরোধী রেজোলিউশন পাশ করানোর চেষ্টা করলে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও বিরোধী দলনেতা বাজপেয়ীজীকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে বেছে নেন। বাজপেয়ীজী জেনেভায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক বার্তালাপ ও আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। জেনেভা যাওয়ার আগে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করে যে, 'প্রধানমন্ত্রী নরসিমারাও তো এক মোক্ষম চাল দিয়েছেন। বাজপেয়ীজী সফল হলে তিনি তাঁর সরকারের সাফল্য দাবি করবেন আর ব্যর্থ হলে বলবেন, বিরোধী দলনেতার কারণে সরকারের এই পরাজয়'। বাজপেয়ীজী উত্তরে বলেন যে— আগে দেশের জয় সুনিশ্চিত হোক। তারপর হার-জিৎ দেখা যাবে। দেশের জয় ছাড়া এই মুহূর্তে কিছুই ভাবছি না'। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা বা প্রধানমন্ত্রী সবরকম দায়িত্বেই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির বিশেষত্ব ছিল— 'রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি'।

তারপর ভারতের রাজনীতিতে শুরু হয় বিজেপির যুগ। বাজপেয়ীজী প্রধানমন্ত্রী হলেন। বিশ্বের বৃহৎ শক্তির চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতকে এক পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত করেন, যাতে ১৯৬২ সালে চীনের কাছে লজ্জাজনক পরাজয়ের গ্লানি যাতে আর দেশকে সহ্য না করতে হয়। পাকিস্তানও প্রতিক্রিয়ায় পারমাণবিক পরীক্ষা করলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও বাজপেয়ীজী তা সামলে নেন। তদানীন্তন পাক রাষ্ট্রপতি নওয়াজ শরিফের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল্লি থেকে লাহোর বাসযাত্রার সূচনা করেন জম্মু কাশ্মীর-সহ দ্বিপাক্ষিক সব সমস্যার সমাধান করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতকতা করে পিছন থেকে ছুরি মেরে কার্গিল যুদ্ধ উপহার দিয়ে ভারত-পাক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এত কিছুর পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি। ২০০১ সালে পাক রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশারফ ভারতে আসেন এবং আগ্রায় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে তর্কবিতর্কের কারণে আগ্রা সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। বাজপেয়ীজী জানতেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তির রাস্তা কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গেছে। তাই ২০০৩ সালে শ্রীনগরে এক বক্তৃতায় ইনসানিয়াত (মানবতা), জমুরিয়াত (গণতন্ত্র) কাশ্মীরিয়াত (কাশ্মীরের সংস্কৃতি)-র কথা বলেন। ২০০৪ সালে পুনরায় বাজপেয়ীজী সার্ক সম্মেলনের জন্য পাকিস্তানে যান, তখন মোশারফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে পাকিস্তানের ভূখণ্ড ভারতে সন্ত্রাসবাদের জন্য ব্যবহৃত হবে না।

২০০৩ সালে তিনি চীন সফর করে চীনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করেন। তিনি শুধু একজন সৎ ও যোগ্য রাজনীতিবিদই ছিলেন না, দেশের একজন সুদক্ষ কূটনীতিকও ছিলেন। তাই তখন ঘোরতর বিজেপি বিরোধী সাংবাদিক এম জে আকবরের মতো মানুষও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে বাজপেয়ীর নাম দুটো কারণে দেশবাসী মনে রাখবে— সড়ক যোজনা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্কের আপ্রাণ চেষ্টা। ২০০৪ সালে বাজপেয়ীর দল হেরে গেলেও পরবর্তী কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বাজপেয়ীর বিদেশ নীতি অনুসরণ করেছেন। ■

দেশপ্রেমিক কবি অটলবিহারী

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

'হার নেহিঁ মানুঙ্গা, রার নেহিঁ ঠানুঙ্গা
কাল কে কপাল পর লিখতা মিটাতা হুঁ!
গীত নয়া গাতা হুঁ!'

এক নতুন ভারতের উদ্ঘোষ, এক বৈভবশালী ভারতের বিজয়গীত রচনা ছিল সুবক্তা, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, স্বভাব কবি অটল বিহারী বাজপেয়ীজীর স্বপ্ন ও সাধনা। গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজ ও আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ অটলবিহারী ছিলেন আর্য কুমার সভার সদস্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ বাবাসাহেব আপ্তের সান্নিধ্যে এসে তিনি হয়ে ওঠেন একজন স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ লাভের পর তিনি হন একজন প্রচারক। কৈশোর ও তরুণ বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলি, দেশ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সামীপ্যে অতিবাহিত দিনগুলি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, 'রাষ্ট্রধর্ম' পত্রিকার সম্পাদনা, দীনদয়ালজীর মর্মান্তিক মৃত্যু, পাঞ্চজন্য-স্বদেশ- বীর অর্জুন পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ, জরুরি অবস্থার কঠিন সময়, ভারত সরকারে পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্ব, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠন, সংসদে দীর্ঘ সময় বিরোধী দলনেতার ভূমিকা পালন, দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়া, পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হওয়া— ৯৪ বছরের দীর্ঘ জীবনে অটলজী সাক্ষী থেকেছেন অসংখ্য চড়াই-উতরাইয়ের, যাঁর প্রভাব পড়েছে তাঁর লেখনীতে, তাঁর রচিত সাহিত্যে। তাঁর লেখা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, নিউ ডাইমেনশনস্ অব ইন্ডিয়া'স ফরেন পলিসি, গঠবন্ধন কী রাজনীতি, কুছ লেখ-কুছ ভাষণ, বিন্দু-বিন্দু বিচার, ডিসাইসিভ ডেইস্, সংকল্পকাল, নঈ চুনৌতি-নয়া অবসর, শক্তি সে শান্তি, মৃত্যু ইয়া হত্যা, অমর বলিদান, মেরি সংসদীয় যাত্রাঁ, ইন্ডিয়া'স পার্সপেক্টিভস্ অন আশিয়ান অ্যান্ড দ্য এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়ন, বিচার বিন্দুর মতো বইগুলো রেখে যায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ও বিশ্লেষণী শক্তির স্বাক্ষর।

'আগ কা দরিয়া হ্যায় অউর ডুব কে যানা হ্যায়'

রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য রচনা ছাড়াও অটলজীর মনোজগৎ ছিল কাব্যিক চিন্তাধারাময়। মেরি ইক্যাওন কবিতায়েঁ, অমর আগ হ্যায়, কাঈদি কবিরাজ কী কুণ্ডলীয়াঁ, কেয়্যা খোয়া-কেয়্যা পায়া, ব্যক্তিত্ব অউর কবিতায়েঁ, চুনি হুয়ি কবিতায়েঁর মতো বইগুলো তাঁর অসাধারণ কবিসত্তার নিদর্শন। 'মেরি ইক্যাওন কবিতায়েঁ' নামক কবিতাগুচ্ছের বঙ্গানুবাদ করেন ড. বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। এই কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতাকে সংগীতের রূপদান করে প্রকাশিত হয় গায়ক জগজিৎ সিংহের মিউজিক অ্যালবাম— 'সংবেদনা'। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর দেশের স্বাধীনতা, সংসদীয় রাজনীতিতে জয়-পরাজয়, এমনকী ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়, আর বিজেপির মাত্র ২ জন এমপি-র দলে পরিণত হওয়া, আবার তারও দীর্ঘ সময় পরে 'রাজতিলক কী করো তৈয়ারি, আ রহে হ্যায় অটল বিহারী' স্লোগানের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁর শপথগ্রহণের মতো ঘটনাবলী সাক্ষী স্বয়ং তিনি। যার পরিণামে অকৃতদার কবির কলম দিয়ে নির্গত হয়েছে— 'পুনঃ চমকেগা দিনকর'-এর মতো অনন্যসাধারণ কবিতা। বিজেপি-র মতো একটি জাতীয়তাবাদী, সর্বভারতীয় দলের নেতৃ, কার্যকর্তা, দলীয় কর্মী, সমর্থক, দেশপ্রেমী জনতার জন্যও তাঁর কলম দিয়ে নির্গত হয়েছে— 'অন্ধেরা হটেগা-সূরজ নিকলেগা-কমল খিলেগা' (আঁধার কাটবে-সূর্য উঠবে-পদ্ম ফুটবে!)-র মতো কবিতা রূপী অভয় মন্ত্র।

'কদম মিলাকর চলনা হোগা'

তাঁর লেখা অসংখ্য কবিতা অনাবিল, নির্মল আনন্দ দানের সঙ্গে ভারতীয়দের দিয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ জীবন-মন্ত্র। হৃদয়তন্ত্রীতে জাগায় এক নিদারুণ অনুরণন! 'বেনাকাব চেহরে হ্যায়ঁ, দাগ বড়ে গহরে হ্যায়ঁ, টুটতা তিলিস্ম্ আজ সচ সে ভয় খাতা হুঁ, গীত নেহিঁ গাতা হুঁ!'— তাঁর লেখা এই ধরনের বলিষ্ঠ পঙ্ক্তি রাজনীতির কারবারিদের মুখ আর মুখোশের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া আসল পরিচয় সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতার আঙ্গিকটি যেন পরিস্ফুট করে। ১৯৯৯ সালে কলকাতার মহাজাতি সদনে তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে, 'অমর আগ হ্যায়ঁ', 'আজ সিন্ধু মে জোয়ার উঠা হ্যায়ঁ'-এর মতো একাধিক সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। হতাশা-নৈরাশ্যের চক্রের পরেই আসতে পারে বিজয়প্রাপ্তি ও সাফল্য লাভের হাতছানি। ঘোর অমানিশার অবসানের পর আসতে পারে নতুন ভোর। সুখ-দুঃখের, আনন্দ-কষ্টের, জয়-পরাজয়ের এই চিরকালীন সময়চক্রের ঘূর্ণনকে উপলব্ধি করেছে, ছুঁয়ে গেছে তাঁর কালোত্তীর্ণ কবিতা সমগ্র। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমিতে ভব্য শ্রীরামমন্দির প্রতিষ্ঠার আসন্ন পুণ্যলগ্নে অকাল দীপাবলীর অমোঘ প্রত্যাশায় এবং বিশ্ব জুড়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়ঘোষের অভিপ্রায়ে তাঁর এই কবিতাটি যেন এক দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা।

'আহুতি বাকী, যজ্ঞ অধুরা
অপনোঁ কে বিঘ্নোঁ নে ঘেরা!
অন্তিম জয় কা বজ্র বনানে,
নব দধীচি হড্ডিয়াঁ গলায়েঁ!
আও ফির সে দিয়া জ্বলায়েঁ!
আও ফির সে দিয়া জ্বলায়েঁ!'

ব্রহ্মবিহারী অটলবিহারী কবিতায় ও ডাকটিকিটে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শাস্ত্রে 'ব্রহ্মবিহার' করার কথা রয়েছে। মানে হলো, 'ছোটো আমি'-র মধ্যে 'বড়ো আমি'-র প্রকাশকে মধুর করা। নিজের মধ্যে অন্যের জন্য মৈত্রী পোষণ করা। এটা তখনই হয়, যখন উপনিষদের মহান বাণীর মতো আমরা ভাবতে পারি, 'সোঽহম্'— অস্যার্থ 'আমিই সেই'। সেই 'বড়ো আমি', সেই 'পাকা আমি', সকল 'আমি'-র সমষ্টিগত আমি— 'ভূমা'। একলা আমি নই, স্বার্থগত আমি নই, কাঁচা আমি নই, ছোটো আমিও নই। এজন্য বড়ো হৃদয় থাকতে হয়। মনুষ্য নির্মাণে অংশগ্রহণ করতে হয়, জন্মভূমিকে ভালোবাসতে হয়। তবেই ব্রহ্ম বিহার করা যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে ব্রহ্মবিহার করা কাকে বলে, ভারতের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর আচরণে, জীবনচর্যায়, মানসচর্চায়, বাক্ মাধুর্যে, চিন্তায়-চেতনায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তিনি ভারতরত্ন, ব্রহ্মবিহারী পদ্মবিভূষণ। অটলজী যেদিন পরলোকগমন করলেন, সেইদিন (১৬ আগস্ট, ২০১৮) অফিস থেকে ফেরার সময় খবর পেলাম আর ট্রেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলাম—

'অটল প্রেরণা আসে অতন্দ্র প্রহর
সনাতনী বোধ জাগে বর্ধিষ্ণু বহর।
পূর্ণতার মহামন্ত্র অন্তরের সুধা
ভারতের পুণ্যভূমে রাজিল বসুধা।
সৌকর্য কবিত্বময় নিরন্তর জাগে
আত্মজয়-সুবচন ধায় পুরোভাগে।'

সেদিন অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর কবিতার কয়েকটি ভালোলাগা পঙ্‌ক্তি বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। যেমন—

'ভারত নয় জমির টুকরো স্বত্ব
এ জাগ্রত রাষ্ট্রীয় পৌরুষত্ব;
যার কঙ্করে কঙ্করে রয়েছে শঙ্কর
বিন্দু বিন্দু জলে গঙ্গারই অন্তর।

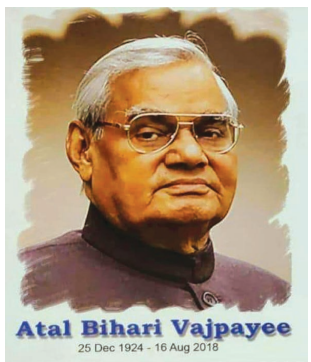

বাঁচবো মোরা রাষ্ট্রেরই জন্যে
আসবে মরণ সে দেশধন্যে।'

মূল কবিতাটির টেক্সট ছিল—

'ভারত জমীন কা টুকরো নহী
জীতা জাগ্রতা রাষ্ট্রপুরুষ হ্যায়।
ইসকা কংকর-কংকর শঙ্কর হ্যায়।
ইসকা বিন্দু বিন্দু গঙ্গাজল হ্যায়
হম জিয়েঙ্গে তো ইসকে লিয়ে
মরেঙ্গে তো ইসকে লিয়ে।'

আরও একটি বঙ্গানুবাদ ছিল এইরকম—

'কাল ছিলেন যিনি
আজ চিহ্ন নাই;
আজ যাহারে চিনি
কাল তিনি কোথায়?
থাকা বা না থাকার এই ক্রম
এমনি তো চলার নিয়ম!
আমরা আছি, আমরা বাঁচি
পালিত হয়েছে এই ভ্রম।'

মূল কবিতাটি ছিল এইরকম—

'জো কল থে,
বো আজ নহীঁ হ্যাঁয়
জো আজ হ্যাঁয়,
বো কল নহীঁ হোঙ্গে।
হোনে ন হোনে কা ক্রম,
ইসী তরহ চলতা রহেগা।
হম হ্যাঁয়, হম রহেঁঙ্গে,
যহ ভ্রম ভী সদা পলতা রহেগা।'

ছোটোবেলা থেকে আমি ডাকটিকিট সংগ্রাহক। পরে ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড-সহ নানান ফিলাটেলিক আইটেম যেমন প্রথম দিনের আবরণী বা খাম (FDC-First Day Cover), বিশেষ খাম (SC-Special Cover), ডাক-বিবরণী (Brochure), ডাক ম্যাগাজিন ও গ্রন্থ ইত্যাদি নিয়ে চর্চা শুরু করি। এই সংগ্রহ ও চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের 'ফিলাটেলিস্ট' (Philatelist) বলা হয়। অটলজীর প্রয়াণের পর এই ডাকটিকিট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করি এবং আমার পরিচিতদের উৎসাহিত করি। দেখা যায় ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ তাঁর জন্মদিনে ভারতীয় ডাকবিভাগ ২ টাকা মূল্যের একটি ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্প প্রকাশ করে। এখানে তাঁর একরঙা আবক্ষ অঙ্কিত ছবি পরিবেশিত হয়েছে। ডাকটিকিট-টি 'Makers of India'-র ১১তম Definitive series-এর অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ আধুনিক ভারত নির্মাণের এক সুমহান কারিগর হিসেবে তিনি ভারতীয় ডাকটিকিটে প্রতিভাত হয়েছেন। এই ডাকটিকিট প্রকাশ উপলক্ষ্যে প্রথম দিনের খামও প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিশেষ একটি খামে (SC) তাঁকে 'ভারতরত্ন রাষ্ট্রনায়ক অটলবিহারী বাজপেয়ী' এই শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চাশ পয়সা মূল্যের একটি পোস্টকার্ডে অটলজীর ছবি প্রদর্শিত রয়েছে। যাদের কাছে এই ডাকটিকিটটি সংগ্রহে নেই, তারা ডাকবিভাগের ফিলাটেলিক ব্যুরোতে যোগাযোগ করতে পারেন। ■

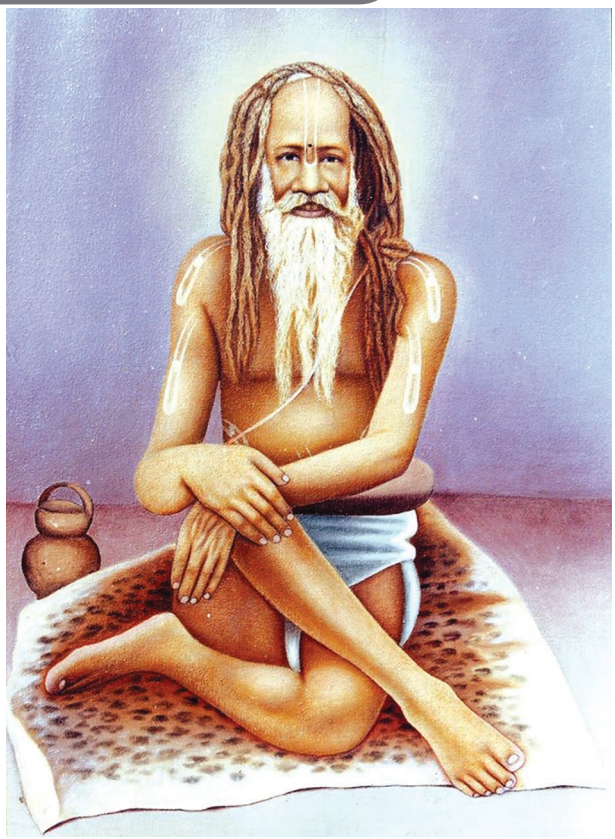

সন্ত কথা

রামদাস কাঠিয়াবাবা

কল্যাণ গৌতম

সনাতন হিন্দুধর্মে অতি শ্রদ্ধেয় সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গদেশে অতি বিরল, দৃশ্য নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়। অথচ পুরো ঊনবিংশ শতক জুড়ে, এমনকী বিংশ শতকের প্রথম দশকেও অধ্যাত্ম জগতে এক উজ্জ্বল সূর্য; ব্রজভূমের ব্রজবিদেহী মহন্ত স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবা। তিনি সম্প্রদায়ের ৫৪তম আচার্য, বঙ্গবাসীকে অসম্ভব ভালোবেসেছেন, কৃপা করেছেন, বঙ্গে বহু খ্যাতনামা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুণীজনকে নির্মাণ করেছেন। রামদাস কাঠিয়া বাবার জন্ম পঞ্জাবের অমৃতসর থেকে ২০ ক্রোশ দূরবর্তী লোনাচামারি গ্রামে, আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে গুরুপূর্ণিমার দিন। অতি সম্মানিত ব্রাহ্মণ পরিবারে পিতা-মাতার তৃতীয় পুত্ররূপে এলেন।

রামদাসের বয়স তখন মাত্র চার। তাঁর বাড়ির কাছেই থাকতেন একজন পরমহংস সন্ন্যাসী বাবাজী, যাঁর সান্নিধ্যে গাঁয়ের সবাই উপস্থিত হতেন এবং দর্শন ও প্রণাম করে ধন্য হতেন। শিশু রামদাসের মধ্যে পরমহংসজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জাগ্রত হলো। একদিন তিনি বাবাজীকে প্রণাম করে বললেন, তিনি কীভাবে সকলের চাইতে শ্রদ্ধায়-সম্মানে এত বড়ো হলেন আর সকলের প্রণম্য হয়ে উঠলেন? পরমহংসজী হেসে বললেন, তিনি সবসময় রামনাম করেন। এই রামনামই তাঁকে মস্ত বড়ো হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। রামদাসও যদি এমনভাবে নিত্য রামনাম করে, তবে সেও একদিন এমনই বড়ো হয়ে উঠবে। শিশু রামদাস বললেন, রামনাম করলেই যদি এমন বড়ো হওয়া যায়, তবে তিনি তাই করবেন। সেই শৈশব থেকেই রামদাস সর্বদা রামনাম জপ করতে লাগলেন। পরমহংসজী তাঁকে রামনামে আরও উৎসাহিত করে তুললেন।

বাড়ির মহিষ চরাতে গিয়ে একদিন তিনি সাক্ষাৎ লাভ করলেন শারীরিক প্রভায় উজ্জ্বল এক সন্ন্যাসীর। তিনি বালক রামদাসের কাছে কিছু খেতে চাইলেন। বাড়িতে তখন সকলে শয়নে থাকায় তিনি তাদের জাগরিত না করে নিজেই ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় ময়দা, চিনি, ঘি নিয়ে সাধুর কাছে ফিরলেন। সাধু সন্তোষ প্রকাশ করে বর দিলেন যে রামদাস একদিন যোগীরাজ হয়ে উঠবেন।

ছয় বছর বয়সে বালক রামদাসের উপনয়ন সংস্কার সাধিত হলো। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে অধ্যয়নের জন্য পাঠালেন অন্য গ্রামে এক পণ্ডিত গুরুমশাইয়ের কাছে। তাঁর বাড়িতে অবস্থান করে গুরুদেবের স্নেহে, শাসনে, আনন্দে ৮-৯ বছর অতিবাহিত করে শাস্ত্র অধ্যয়নের পাঠ নিলেন তিনি। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, স্মৃতিশাস্ত্র ছাড়াও পাঠ করলেন বিষ্ণুর সহস্রনাম, শ্রীমদভগবদগীতা ইত্যাদি গ্রন্থ।

গীতা পাঠ করে রামদাসের অনুভূতি কেমন হয়েছিল তা উল্লেখ আছে সন্তদাস কাঠিয়াবাবা রচিত রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনচরিতে, 'গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়া আমি বোধ করিতে লাগিলাম, যেন আমার প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। গীতা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইল। আমি পূর্ণ মনে নিত্য ইহা অভ্যাস করিতে লাগিলাম। অতঃপর গীতা অধ্যয়ন যখন আমার সমাপ্ত হইল, তখন আমার পণ্ডিত গুরুজী আমাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি করিলেন। শ্রীমদভগবদগীতা আমার এতই প্রিয় ছিল যে, ওই গীতা গ্রন্থ আমার বক্ষের উপর রাখিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া গুরু-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতৃভবনে উপস্থিত হইলাম।'

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পিতা তাঁর বিবাহের উদ্যোগ শুরু করলেন, কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃত হলেন। এরপর তিনি গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করবার মানসে গাঁয়েরই উপান্তে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায় বসে সওয়া লক্ষ জপ পূর্ণ করলেন। সন্তুষ্ট হলেন গায়ত্রী দেবী। দৈববাণী হলো, অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার জপ যেন তিনি সেখান থেকে ৩০-৩৪ ক্রোশ দূরে জ্বালামুখীতে গিয়ে সম্পন্ন করেন। পথে যেতে তিনি পেলেন তেজঃপুঞ্জকলেবর বৃহৎ জটাধারী সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর মস্তক মুণ্ডিত হলো। তিনি 'বৈরাগ-আশ্রম' গ্রহণ করলেন। পিতা-মাতার আপত্তি শুনলেন না। গুরুদেবের আজ্ঞায় আপন জন্মস্থানে মানুষের মধ্যে দৈবী চেতন জাগ্রত করার জন্য এক নির্জন বটবৃক্ষতলে আসন স্থাপন করলেন।

কিন্তু বাল-বৈরাগ্য অবস্থায় স্ত্রীলোকের পরিকল্পিত আকর্ষণে এবং মোহে বিপদ ঘটতে পারে, এমন বিবেচনা করে তিনি চিরদিনের জন্য আপন জন্মস্থান পরিত্যাগ করলেন। আর কখনও সেখানে ফিরে আসেননি। পরেও অন্যত্র অতি রূপ-যৌবনসম্পন্না নারীর আকর্ষণী শক্তিকে ভগবৎ-কৃপায় অতিক্রম করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর বাল-বৈরাগ্য অবস্থায় উত্তরাখণ্ডে গঙ্গোত্রীর নিকট এক পাহাড়ের ভূমি সংলগ্ন গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিপদে পড়েন। ভগবৎ-কৃপায় রক্ষাও পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন অতি বৃহৎকায় বহু প্রাচীন সুপক্ক জটাজুটধারী পুরুষ যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। রামদাসের উপস্থিতিতে ধ্যানভঙ্গ হলে বৃহৎ চোখে যেন অগ্নিবর্ষিত হতে লাগলো। সেই সাধুর কাছে পরীক্ষাটি ছিল প্রাণান্তকর। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সেদিন। হিমালয়ের স্থানে স্থানে এমনই রয়েছে বহু প্রাচীন ঋষির লুকানো তপস্যাভূমি। অবশেষে স্নেহভরে রামদাসকে উঠিয়ে সেই স্থান থেকে অনতিবিলম্বে প্রস্থান করতে বললেন সেই সাধু।

রামদাসের গুরুদেব ছিলেন শ্রীদেবদাসজী কাঠিয়াবাবা। দেবদাসজীর জন্ম অযোধ্যার কাছে, তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৩তম আচার্য এবং যোগীশ্বর সিদ্ধপুরুষ। তিনি ছয়মাসকাল একাসনে থেকে সমাধিস্থ হতে পারতেন, এমনই সাধু সমাজে প্রচলিত আছে।

হিন্দু ধর্ম যাজনের বিষয়ে হিন্দুদের উপর বিধর্মীদের কোনো অন্যায় নির্দেশ মেনে নিতেন না শ্রীদেবদাসজী। তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্ভবত তৃতীয় অথবা চতুর্থ দশক। ইংরেজ শাসন শুরু হলেও জায়গায় জায়গায় নবাব ও দেশীয় রাজাদের শাসন তখন চলছে। মহা বিদ্রোহ তখনও সংঘটিত হয়নি, রেলপথও পাতা হয়নি। ভূপাল-তালের কাছে এক মুসলমান নবাবের বসত ছিল। তিনি হিন্দুদের জন্য ঘোষণা করিয়েছিলেন, তাঁর বাসস্থানের কাছে কোথাও কেউ শঙ্খধ্বনি অথবা ঘণ্টাধ্বনি করতে পারবেন না। দেবদাসজী তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে উপনীত হলেন। নিজ শিষ্যদের বেশ কিছুটা দূরে রেখে ভূপাল-তালের উপর নিজের আসন স্থাপন করলেন এবং সজোরে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। নবাবের কানে তা পৌঁছালো। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং পারিষদবর্গকে খবর নিতে পাঠালেন। তারা এসে দেখলেন, এক জটাজুটধারী তেজস্ব তপস্বী শঙ্খবাদন করছেন। নবারের কাছে সংবাদ পৌঁছালো। আদেশ অমান্যের শস্তি স্বরূপ নবাব তাঁর শিরশ্ছেদ করার আদেশ জারি করলেন। সশস্ত্র অনুচরেরা তা কার্যকর করতে এসে দেখলেন সেখানে কোনো জীবিত মানুষ নেই, বরং সেই সাধুর দেহের নানান কর্তিত অংশ ছড়ানো রয়েছে। তারা ফিরে নবাবকে খবর দিলেন, আগেই কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি সাধুর শরীর খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন, অতএব সমস্যাও দূরীভূত হয়েছে।

কিন্তু অনতিবিলম্বে দেবদাসজী পুনরায় অতিশয় বেগের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করলেন, নবাবের কানে গেল। তিনি এবার বিস্মিত হলেন। অনুচরেরা ফের এসে দেখলেন, মানুষ তো নেই-ই, শরীরের কর্তিত অংশগুলিও অদৃশ্য। সংবাদ জানানো হলো নবাবকে। ফের শঙ্খধ্বনি। নবাব এবার ভয় পেলেন। বুঝলেন কোনো সিদ্ধ পুরুষের কাজ এটা। যিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, তিনিই তা করছেন, এই ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ করা চলে না। তাঁর অভিশাপে রাজ্যে বিঘ্ন এবং অনিষ্ট হতে পারে বিবেচনা করে তিনি সপার্ষদ শঙ্খবাদন স্থলে পৌঁছালেন। শঙ্খহাতে তখন স্বামী দেবদাস কাঠিয়া বাবাজী বসে আছেন। নবাব দর্শন করলেন এবং যথোপযুক্ত অভিবাদন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যোগীপুরুষের কী অভিপ্রায় জানতে চাইলে দেবদাসজী বললেন, 'এই শঙ্খ ঘণ্টা বাদন করিতে যে তুমি প্রতিষেধ করিয়াছ ইহা অতি অন্যায়; তুমি মুসলমান, তোমার ধর্ম তুমি যাজন কর; কিন্তু হিন্দু হিন্দুর ধর্ম যাজন করিবে, ইহাতে তুমি কেন বিঘ্ন উৎপাদন করিবে? তোমার এই আদেশ প্রত্যাহার কর। আর এই তালের নিকট এক মন্দির আছে, তাহার সংস্কার করিয়া আমি প্রস্তুত করাইব, তাহাতে তুমি কোনো বাধা দিতে পারিবে না।' নবাব তা মেনে নিলেন এবং দেবদাসজীকে অভিবাদন করে ফিরে গেলেন। ভূপাল-তালে ঠাকুর-মন্দিরও সংস্কার সাধিত হয়ে প্রস্তুত হলো, তা বৈষ্ণব সমাজের কাছে এক পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র (পৃ. ১৮-২০)।

গুরুগৃহে রামদাস দৈনিক পাঠ অভ্যাস হয়ে যাবার পর খেলাধুলায় না মেতে মালা হাতে রামনাম জপ করতে বসতেন। বাল্যকালে পরমহংসজী তাঁকে রামনাম করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এদিকে গুরুপুত্র ও অন্যান্য বালকেরা তাঁকে ঈর্ষা করতেন, কারণ পণ্ডিত-গুরুর অত্যধিক স্নেহ তিনি পেতেন। তাঁরা গুরুদেবকে নালিশ জানালেন, এ ছেলে সারা দিন কেবল মালা টপকায়, মোটেই বই নিয়ে বসে না, অথচ তাকে ভালো বলা হয়, ভালোবাসাও হয়। পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গে রামদাসকে ডেকে পাঠালেন। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, সে কি লেখাপড়া না করে শুধুই মালা টপকায়? ছেলেরা এমন অভিযোগ করছে কেন? রামদাস হাতজোড় করে বললেন, তিনি পড়েন না, একথা সত্য নয়। পরীক্ষা করার জন্য গুরুজী বই আনিয়ে নানান জায়গা থেকে নানান বিষয়ে কঠিন প্রশ্ন করলেন। কিন্তু রামদাসের কাছ থেকে ঠিকঠাক জবাব পেলেন। সঠিক উত্তর পেয়ে তিনি খুশিও হলেন। অভিযোগকারী বালকদেরই এবার মিথ্যাবাদী বলে ধমকে দিলেন। বললেন, পাঠাভ্যাস হয়ে যাবার পর মালা যদি কেউ জপেই থাকে, তাতে অপরাধ কোথায়? এরপর রামদাসের উপর গুরুজীর স্নেহ আরও বেড়ে গেল। রামদাসও অতি দ্রুত পাঠ ও পাঠাভ্যাস শেষ করে পূর্ণানন্দে মালা সহযোগে রামনাম জপ করতে লাগলেন।

বাঙ্গালি মৎস্যাহার করে বলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু মানুষ এক সময় ঘৃণার চোখে দেখতেন বাঙ্গালিকে এবং কদাচার বলে গণ্য করতেন। রামদাস বাবাজী তা যথার্থভাবে বিবেচনা করেছেন। বৃন্দাবন আশ্রমে একদিন রামদাসজী এবং আরও কয়েকজন ব্রজবাসী কথাবার্তা বলছিলেন। সেখানে শিষ্য সন্তদাসও উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জনৈক ব্রজবাসী বললেন, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত মাছ খায়, অন্য বিষয় যাই হোক, এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য আচার।

সন্তদাসজী বললেন, ব্রজভূমে ও অন্যত্র মাছের ব্যবহার নেই, তাই ব্রজবাসীরা মৎস্যাহার ঘৃণা করেন। কিন্তু সেখানে এমন অনেক আচার রয়েছে, যা বাঙ্গালির চোখেও অত্যন্ত ঘৃণ্য। যেমন পশুর চামড়ার তৈরি মশক বাহিত জল পান করাকে বাঙ্গালিরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন।

সেসব দেশে প্রস্রাব করে ব্রাহ্মণেরা জলশৌচ করেন না; পথচলতি মানুষ একস্থানে বাহ্য গিয়ে আর এক স্থানে জল পেলে জলশৌচ করেন। সেই একই পরিধানের কাপড় না কেচে বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করেন, দুর্গন্ধ হলেও পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন করেন না। বাঙ্গালিরা এরকম আচারকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। অর্থাৎ শিষ্য সন্তদাসজী বোঝাতে চাইলেন, অনেক দেশের অনেক আচার রয়েছে, যা অন্য দেশীয় লোকের কাছে ঘৃণ্য।

এই উত্তর শুনে ব্রজবাসী পুনরায় বললেন, এসব আচার নিঃসন্দেহে কদাচার হতে পারে, কিন্তু তাতে, আর যাইহোক, কোনো জীব হিংসা হয় না। কিন্তু যেখানে মৎস্য ভক্ষণের রেওয়াজ সেখানে জীবহত্যা ঘটে এবং তাতে বহু পাপের জন্ম হয়। সন্তদাসজী (তখন তারাকিশোর চৌধুরী নামে পরিচিত) প্রত্যুত্তরে বললেন, ভগবান জীবকে জীবের আহারের জন্য প্রায় সর্বত্রই বিধান দিয়েছেন। তাছাড়া উদ্ভিদও জীব, হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। উদ্ভিদকে নিবিষ্ট হয়ে পরীক্ষা করলেও দেখা যাবে তার আহার-বিহার, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা সবই আছে। জীব-ব্যাপারে অন্য জীবের সঙ্গে উদ্ভিদ সমভাবেই আছে। ফলমূল, বীজ সমস্তই জীবময়। গম যা আমরা আহার করি, তা মাটিতে পুঁতে রাখলে বৃক্ষরূপ ধরে, অতএব গমের দানাও জীব। বহু জীব জলে এবং বায়ুতে আছে, তা খালি চোখে দেখা যায় না। দেখা যায় না বলে, বলা যায় না তাতে জীব নেই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য সেইসব জীবকে দৃষ্টিগোচর করা যায়। সন্তদাস আরও বললেন, জলপান করলে বহু জলীয় জীবের বিনাশ ঘটে। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে বহুজীব প্রতিনিত বিনষ্ট হচ্ছে। অতএব জীবহিংসা সম্যকভাবে পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। তবে শাস্ত্রের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবহিংসা করলে পাপ হয়। মৎস্যাহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে মৎস্য ভক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই সন্তদাস এমত সিদ্ধান্তে এলেন, মৎস্যাহার বিষয়ে বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে এই নিন্দা প্রশংসনীয় নয়।

রামদাস বাবাজী তাদের সকলের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তিনি একটি কাহিনির অবতারণা করলেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একজন সুপণ্ডিত ও সূর্যমন্ত্রে সিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কাছে বহু বিদ্যার্থী বেদ, দর্শন প্রভৃতি নানান শাস্ত্র অধ্যায়ন করতেন। তার মধ্যে একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন। সবচাইতে অধিক মেধাবী ছিলেন তিনি। জ্ঞানে, আচরণে, সেবায়, ভক্তিতে তিনি গুরুদেবের সবচাইতে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে তিনি সূর্যমন্ত্রে সিদ্ধিলাভও করলেন। পরিশেষে জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কলেন। গুরুদেব এতই তাঁকে স্নেহ করতেন যে, কিছুদিন পর শিষ্যকে দেখতে মন টানলো বঙ্গদেশে। গুরুদেব গেলেন বঙ্গে। বঙ্গদেশে গিয়ে দেখলেন শিষ্যগৃহে মৎস্যাহারের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। তা দেখে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন তিনি। শিষ্যকে ভর্ৎসনা করে কদাচারী আখ্যা দিলেন।

শিষ্য বিনীতভাবে বললেন, গুরুদেবের কৃপায় শ্রীসূর্যনারায়ণের প্রসন্নতা তিনি লাভ করেছেন। দেবতা প্রতিদিন তাঁর গৃহে মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করেন। তা কদাচার হলে কখনও সম্ভব হতো না। শিষ্য মাছের নানান ব্যঞ্জন তৈরি করিয়ে গুরুদেবকে পাশে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাকে ভোগ নিবেদন করলেন। দেবতা এসে তা অঙ্গীকার করলে গুরুদেব নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং স্বয়ং ওই প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন পর তিনি ফিরে গেলেন। আপন সমাজে সকলকে বললেন, বঙ্গদেশে মাছের ব্যবহার রয়েছে বলে, বাঙ্গালিকে ঘৃণার চোখে দেখা উচিত নয়। মৎস্যাহারে দোষ নেই। তিনি নিজ চোখে সূর্যনারায়ণকে মাছের ভোগ গ্রহণ করতে দেখেছেন। মাছ অপবিত্র হলে দেবতার অঙ্গীকার কখনোই সম্ভব হতো না। ব্রাহ্মণ-সমাজ বললেন, তাদের প্রত্যক্ষ করাতে হবে এই ভোগ গ্রহণ, তবে তারা মানবেন। কিন্তু পরদিন সকলের সামনে মাছের নানান ব্যঞ্জন তৈরি করে মন্ত্র দিয়ে আহ্বান করলেও দেবতাকে আনতে পারলেন না তিনি। অপ্রতিভ হয়ে অবশেষে অনশনে বসলেন এবং সূর্যনারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

তৃতীয় দিনে তিনি শ্রীসূর্যের সাক্ষাৎ লাভ করলে দেবতা জানলেন, প্রদত্ত ভোগ অত্যন্ত অপবিত্র ছিল, তাই তিনি গ্রহণ করেননি। যে মৎস্যভোগ বঙ্গদেশে তিনি গ্রহণ করলেন, তা এখানে অপবিত্র হলো কীভাবে? সূর্যদেবতা জানালেন, বঙ্গে মৎস্যাহার অপবিত্র নয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বঙ্গদেশে মৎস্যাহার অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দেশে করে, তাই তা সেখানে বর্জিত। বর্জিত দেশে প্রচণ্ড অপবিত্র ভোগ তাই তিনি গ্রহণ করেননি। একথা শুনে পণ্ডিতজীর যাবতীয় সংশয় দূর হলো এবং দেবতার কৃপায় সমাজে তিনি পুনরায় শ্রদ্ধার আসন লাভ করলেন।

রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর মৎস্যাহার বিষয়ে বক্তব্য ছিল, যে আচার বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, সেখানে সেই আচার পালন করা দোষের নয়। নানাবিধ অবস্থা বিবেচনা করে এই আচার কোনো প্রদেশে প্রবর্তিত হয়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি বলেছেন, মৎস্য গ্রহণ ব্যাপারে দেশাচার অনুসরণ করতে তাঁর বারণ না থাকলেও মাংস ব্যবহার না করাই শ্রেয়। আরও বলেছেন, বৈষ্ণবদের পক্ষে মৎস্য-মাংস ব্যবহার না করাই প্রশংসনীয়। তীর্থস্থান যেমনই হোক না কেন, সেখানে মাছের ব্যবহার সঙ্গত নয় (পৃষ্ঠা ১২৫-২৬)।

তথ্যসূত্র : *ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত, সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০০৯, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচর, উত্তর ২৪ পরগনা।*

তুলসীপূজন অর্বাচীনকৃত্য নয়, হাজার বছরের ধর্মীয় উত্তরাধিকার

শীর্ষ আচার্য

ইদানীং ২৫ ডিসেম্বর সনাতনী ধর্মসংস্কৃতির প্রবুদ্ধজন তুলসীপূজন করে, গীতা অনুধ্যান করে দিনটির মাহাত্ম্যে হিন্দুয়ানি পুরোপুরি প্রোথিত করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের পাতায় বয়ে চললো হিন্দু সংস্কৃতির সীমাহীন স্রোত। থামছেই না, এ এক অপ্রতিরোধ্য প্রবাহ, স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দুত্ব। আর এতেই ম্লান হয়ে পড়েছে ২৫ ডিসেম্বরের ক্যালেন্ডারি-উৎসব। হিন্দুজন আপন সৌকর্যে বিনা রক্তপাতে জয় করে নিয়েছে কলোনিয়াল কালচার।

প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বরে পালিত হয় তুলসীপূজন দিবস। বিভিন্ন মঠ-মিশন, হরিসভাতে ডিসেম্বরের ২০ থেকে ৩১-এর মধ্যে ইংরেজি নববর্ষের প্রাক্কালে এমনিতেই নানান কথকতার আয়োজন হয়, ধর্মসভা পরিচালিত হয়, সংকীর্তনের পরিবেশ গড়ে ওঠে। শীতের বিকেল থেকে সন্ধ্যায়, হরির লুঠ এবং জমজমাট ধর্মসংস্কৃতির বাতাবরণ। এরই সঙ্গে জুড়ে গেল ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। কল্পতরু দিবস। হিন্দুত্বের জাদুতে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিও অম্লান।

Ocimum sanctum হচ্ছে তুলসীর উদ্ভিদবিদ্যাগত নাম। ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Basil; এটি Lamiaceae পরিবারভুক্ত একটি অসাধারণ উদ্ভিদ। পূত-পবিত্র এবং উপকারী। হিন্দু সংস্কৃতিতে আছে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে টানা একমাস তুলসীমঞ্চে তুলসীধারার ব্যবস্থা হিন্দুর ঘরে ঘরে। একটি মাটির হাঁড়ির তলায় ছোটো একটি ফুটো করে, তাতে পলতের কাপড় দিয়ে ধীর ধারায় সেচের বন্দোবস্ত করা হয়। একে বিন্দুপাতি সেচ বলা যেতে পারে, ইংরেজিতে Drip irrigation। আর আবৃত্তি করা হয় 'তুলসী তুলসী নারায়ণ/তুমি তুলসী বৃন্দাবন/ তোমার শিরে ঢালি জল/অন্তকালে দিও স্থল।' তুলসী জীবনকালে যেমন এক মহার্ঘ ভেষজ, অন্তিমকালেও মায়াজাল-মুক্তির এক মহৌষধি। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল তাঁর কাব্যে লিখছেন, 'তোমার নিঃশ্বাসে/সর্বরোগ নাশে/যায় দুঃখ পলাইয়া।'

এমন একটি উদ্ভিদ আধ্যাত্মিক দুনিয়া দখল করে বসেছে তার বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের সমারোহে, তাকে সামগ্রিকভাবে Basil-lore বা তুলসী-চারণা বলা চলে। তুলসী পূজন তাই অর্বাচীন কৃত্য নয়, হাজার হাজার বছরের ধর্মীয় উত্তরাধিকার। এই পূজা ডিসেম্বর মাসেই কেন করা হয়, তা জিজ্ঞেস করেছিলাম কৃষি ও লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তীকে। তিনি যা বললেন এবার তা সূত্রাকারে উপস্থাপিত হলো।

১. মাইগ্রেশনের কারণে হিন্দুরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। ইসকন-সহ নানান হিন্দু সংগঠনের চেষ্টায় অনেক বিদেশিও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। এদের বহু মানুষ রয়েছেন শীতপ্রধান দেশে, যেমন ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি জায়গায়। এসময় শীতের হাত থেকে তুলসীগাছকে রক্ষা করা একটি সমস্যা। পূজার অন্তরালে আসলে তুলসীগাছকে বিশেষ যত্নআত্তি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

২. কিছু জড়পদার্থ দিয়ে কৃত্রিম 'ট্রি' বানিয়ে ফেস্টিভ্যালের বদলে সজীব ও মূল্যবান ঐশী ভেষজ উদ্ভিদকে সাজিয়ে কৃতজ্ঞতায় পূজা করা অনেক বেশি বাস্তবোচিত।

৩. বর্ষাকালের শেষে তুলসীর মঞ্জরী মাটিতে পড়ে এবং কেয়ারিতে বীজ ফেলে নতুন চারা তৈরি হয়। তুলসীমঞ্চে, টবে সেই চারা ধীরে ধীরে শাখাপ্রশাখা ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠে। এসময় তুলসীপূজনের মধ্যে আরাধ্য উদ্ভিদের একটি সম্পূর্ণ সৌধ (Plant architecture) নির্মিত হয়। তাই পূজার মধ্যে গাছের এক শ্রীময়ী রূপ প্রকাশিত হয়। গাছের বিটপের শীর্ষে শীর্ষে তখন পুষ্পমঞ্জরী, কোনো কোনো শাখায় শুকনো বীজ। অর্থাৎ ফলে-ফুলে-পল্লবে এক অপরূপ সৌন্দর্য, পূজনে- আরাধনায় আলাদা প্রেরণা জোগায়।

৪. কোনো দেশে বিধর্মী কলোনিয়াল শক্তির বিকাশের পর তিনটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একদল সেই ধর্মসংস্কৃতিকে সরাসরি গ্রহণ করেন, আরেকদল সরাসরি বিরোধিতা করেন, অন্য একটি দল নীরব বিপ্লবে আপন ধর্ম সংস্কৃতির সৌকর্যে তা অতিক্রম করে যান। ভারতে ইংরেজদের বিপরীতে হিন্দুরা যে ত্যাগব্রত দিবস পালন করছেন, ধুনি-সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করছেন, তুলসীপূজন দিবস প্রচলন করছেন অথবা কল্পতরু উৎসবের আয়োজন করছেন, তা এক ধরনের মহা-অতিক্রমণ। তাই তুলসীপূজন এক রক্তপাতহীন ধর্মীয় জয়। বিরোধিতা, অবরোধের বদলে আপন ধর্মের তুরীয়ানন্দে বুঁদ হয়ে থাকা। দারুণ এক দর্শন। তুলসীপূজন মানে ভারতীয় ভেষজের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তুলসীপূজন হিন্দুধর্মের সর্ব ব্যাপকভাবে এক অনবদ্য প্রকাশ। □

শিষ্য সামীপ্যে গীতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ১৮৯৯ সালে বেলুড় মঠ নির্মাণকালে একদিন বললেন, 'বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতা সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।' আরও বললেন, দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।' শিষ্য বললেন, কেন বৃন্দাবনলীলা মন্দ কী? স্বামীজী বললেন, এখন শ্রীকৃষ্ণের ওইরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুভবুদ্ধি-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা (পৃ. ১৫৩)।

শিষ্য ফের জিজ্ঞেস করলেন, বৃন্দাবনলীলা কি সত্য নয়? স্বামীজী বললেন, তা কে বলছে? ওই লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাশক্তির সময় ওই লীলার উচ্চভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না (পৃ. ১৫৪)। অন্যত্র এই শিষ্যকে স্বামীজী বলেছিলেন, ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য ব্যাকুলতা বা উন্মাদ হওয়াই ধর্মপ্রাণতা। গোপীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যেমন উদ্দাম উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্যও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই (পৃ. ১২)।

১৮৯৭ সালে একদিন গোপাললাল শীলের বাগানে আসেন স্বামীজী; শিষ্য শরচ্চন্দ্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে সেদিন কথা উত্থাপিত হলো। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' রূপে অভিহিত

করলেন। 'বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী, তাও দ্যাখ— অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর— শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতা বলছেন! —ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন— অস্ত্র ধরলেন না! যেদিকে চাইবি দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র পারফেক্ট জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ— তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ!' শ্রীকৃষ্ণের কোন ভাবটির ইদানীং বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন সেদিন বললেন স্বামীজী। এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা। তবে লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে (পৃ. ১২)। কর্ম ছাড়া উদ্ধারের আর অন্য পথ নেই।

১৮৯৮ সালে বেলুড়ে স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে পুনরায় গীতোক্ত কর্মযোগ এবং সেই সংক্রান্ত সাহস অবলম্বনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, শুধু ধ্যানে নিযুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম নয়। কর্মযোগ করলে লোক জেগে উঠবে, 'এখন চাই গীতায় ভগবান যা বলেছেন— প্রবল কর্মযোগ— হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা।' নইলে মানুষ যে তিমিরে রয়েছে, সে তিমিরেই থাকবে (পৃ. ১৭৭)।

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' ও 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক যথাক্রমে শরচ্চন্দ্র এবং নিবেদিতা। দুটি গ্রন্থই স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে রচিত। ফলে গ্রন্থ দুটির গীতা-ভাবনা স্বামীজীরই গীতা অনুধ্যান মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া স্বামীজীর মুখেই কথাগুলি বসানো হয়েছে। নিবেদিতার গ্রন্থের প্রেক্ষাপট শুরু ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। শরচ্চন্দ্রের বিবরণ শুরু স্বামীজীর প্রথমবার বিলাত থেকে আসবার পর, বাগবাজার বলরাম মন্দিরে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচিত নানান বিষয় বিচার ও শাস্ত্রপ্রসঙ্গ দিয়ে। এতক্ষণ 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ থেকে আলোচিত হলো।

এবার নিবেদিতা রচিত গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করা হবে। স্বামীজীর কাছে গীতা একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ, আবার সৌন্দর্যের খনি— জানিয়েছেন নিবেদিতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা, সেই প্রচণ্ড তেজঃপূর্ণ যুদ্ধ স্বামীজীর মস্তিষ্কে বিশেষ আলোড়ন তুলতো। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে' (গীতা, ২/৩) বাক্যে সেই শক্তিপূর্ণ আরম্ভ। নিবেদিতা লক্ষ্য করেছেন, হিন্দুধর্মের প্রচারক ও স্রষ্টা হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজীর এমন আবেগপূর্ণ মনোভাব ছিল, যা ভগবান বুদ্ধের প্রতি ব্যক্তিগত প্রগাঢ় অনুরাগের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী ভাবের চাইতে বুদ্ধের সন্ন্যাস আদর্শ স্বামীজীর কাছে প্রায় দুর্বলতা বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলির পাশাপাশি গীতাগ্রন্থটি যেন সকলের কাছে স্বস্তি বহন করে এনেছে, এমনটাই স্বামীজীর মত— উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা (পৃ. ১২১)। গীতার যে গভীর অর্থপূর্ণ বাক্যগুলি বাল্যকালে পড়তে পড়তে থেমে যেতেন স্বামীজী এবং বহুদিন ধরে ওই কথাগুলি তাঁকে আলোড়িত করত এমন শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন নিবেদিতা—

'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিত।।' (১২/১৮)

অর্থাৎ যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে-গ্রীষ্মে, সুখে-দুঃখে এবং নিন্দা-স্তুতিতে সম-ভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ-বর্জিত, সংযতবাক্, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই রকম ভক্ত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

স্বামীজী ইংল্যান্ড ১৮৯৫ সালে বক্তৃতাকালে গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন, যা শুনেছিলেন নিবেদিতা (তখন তাঁর নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল)। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (পৃ. ৫)।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় হি সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'

এটি গীতার জ্ঞানযোগের চতুর্থ অধ্যায়ের ৭-৮ সংখ্যক শ্লোক।

স্বামীজীর মতে শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মে উপনীত হতে হয়, যেখানে সব এক অখণ্ড সত্তারূপে বিরাজমান এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ। 'শক্তিপূজা ও স্বামীজী' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন গীতার বেদতুল্য বাক্য স্বামীজীর স্মৃতিপথে উদিত হবার কথা (পৃ. ১০১)। কর্মের আরম্ভমাত্র না করে কোনো ব্যক্তিই নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না। শুধু কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি করতলগত হয় না।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।

এটি গীতার কর্মযোগের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ সংখ্যক শ্লোক।

ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনায় নিবেদিতা জানাচ্ছেন, কোনো ব্রত নিয়ে যারা সিদ্ধিলাভ না করতে পারে, তাদের কী গতি হয়। স্বামীজী এর উত্তর দিতে গিয়ে গীতার ধ্যানযোগের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৭-৩৮ সংখ্যক শ্লোক আবৃত্তি করেন—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।। ৩৭ ।।
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মবাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।। ৩৮।।

হে কৃষ্ণ, যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনো যোগ অভ্যাস করতে আরম্ভ করে তাতে সিদ্ধিলাভ না করতে পারলে তাদের কী গতি হবে? ব্রহ্মমার্গে অবস্থান করতে না পেরে তারা কি উভয় কুল হারিয়ে বায়ুতড়িত মেঘের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে?

স্বামী বিবেকানন্দ গীতা গ্রন্থের দ্বারা নিজে কতটা প্রভাবিত ছিলেন এবং সুদর্শন চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কতটা চাইতেন, তাঁর দুই প্রখ্যাত শিষ্যের রচনার মধ্যে তা খানিকটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বামীজী গীতা গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করে ফুটবল খেলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কোনো কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যদি এমনটা প্রচার করেন, তবে সে ধারণা সত্যি নয়। গীতার অমূল্য বাণী কোনো হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছেই কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। গীতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলেই সমাদৃত ও সর্বজনমান্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

(উদ্বোধন প্রকাশিত যে গ্রন্থদুটি এখানে তথ্যসূত্র রূপে প্রদত্ত হয়েছে তা যথাক্রমে জুন, ২০১৭, ৩৩তম পুনর্মুদ্রণ এবং ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ পুনর্মুদ্রণ)

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমিতি দ্বারা জেলাস্তরীয় একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২৩-এর অঙ্গ হিসেবে অনূর্ধ্ব ১৭ বছর জনজাতি পুরুষ ১০ দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলো গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব ময়দানে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় ফিলিপ বাস্কে। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্বক্ষেত্র গ্রামবিকাশ প্রমুখ আশিস কুমার দাস, গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের সভাপতি সুদেব হালদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমিতির সভাপতি ডাঃ অনিরুদ্ধ গুহ, সহ সভাপতি দেবাশিস ভট্টাচার্য, সম্পাদক উত্তম কর্মকার, জেলা সমিতির সদস্য কাঞ্চন বসাক, উত্তম বসাক, গোবিন্দ কুজুর, নবীন টপ্পো, স্বপন হেম্বরম প্রমুখ। জনজাতি সমাজের যুবকদের ফুটবল খেলায় দর্শক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। খেলায় বিজয়ী দল হিসেবে পুরস্কৃত হয় কুশমণ্ডী ব্লকের বাসুদেবপুর এসটি কোরা দল এবং রানার-আপ হিসেবে পুরস্কৃত হয় তপন ব্লকের জামালপুর আদিবাসী কার্তিক ওরাঁও স্মৃতি সঙ্ঘ। খেলার শেষে জেলা সভাপতি জানান, প্রতি বছরের মতো এবারেও জেলাস্তরীয় একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হলো, রাজ্যস্তরীয় খেলা হবে শিলিগুড়িতে আগামী ২৫,২৬ ডিসেম্বর।

উত্তরের সংস্কার ভারতীর বিজয়া-দীপাবলী শিল্পী সম্মেলন

উত্তরের সংস্কার ভারতী মালদহ জেলার বিজয়া-দীপাবলী উপলক্ষ্যে শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ১০ ডিসেম্বর মালদহ শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুদর্শন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর সরকার, জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সহসভাপতি শুভঙ্কর দাস, স্থানীয় পুরসভার কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি ও কৃষ্ণা নাথ এবং মৌসুমী মিত্র ও আলি হোসেন। এছাড়াও সংস্কার ভারতীর জেলা পদাধিকারী শ্যামল কুণ্ডু, নারায়ণী ব্যানার্জি, কৌশিক দাসবক্সী, সজল দত্ত ও রুমা চৌধুরী। অতিথিদের বরণ করার পর প্রদীপ প্রজ্বলন ও সমবেত ভাবসংগীত গাওয়া হয়। তারপর নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। প্রস্তাবিক ভাষণ রাখেন কৌশিক সরকার। সাংগঠনিক ভাষণ রাখেন সঞ্জয় নন্দী।

প্রধান অতিথি সুদর্শন চৌধুরী সম্মেলনের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্র বন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নাগপুরে ত্রিদিবসীয় সন্ত মিলন অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব প্রচারক, বর্তমানে সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করছেন এরকম সন্ন্যাসীদের নিয়ে গত ১২,১৩,১৪ ডিসেম্বর নাগপুরে রেশিমবাগস্থিত ডাঃ হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দির পরিসরে ত্রিদিবসীয় সন্ত মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে ৫৯ জন সন্ন্যাসী এই মিলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১২ ডিসেম্বর সকালে স্মৃতিমন্দির দর্শনের পর মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহে পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক এবং সরকার্যবাহের উপস্থিতিতে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুরেশ সোনী, সহ সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল জী, অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ সুরেশচন্দ্র জী, পূর্ব সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, অখিল ভারতীয় কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ রবীন্দ্রজী, অখিল ভারতীয় ধর্ম জাগরণ প্রমুখ শরদ ঢোলেজী, অখিল ভারতীয় সমরসতা প্রমুখ রবীন্দ্রজী।

প্রবীণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিদ্বারের জগদ্‌গুরু রাজরাজেশ্বরানন্দ মহারাজ, বারাণসীর মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী যতীন্দ্রানন্দ সরস্বতী, হরিদ্বার প্রাচীন অবধূত আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী রূপেন্দ্রপ্রকাশজী, হরিদ্বার ভারতমাতা মন্দিরের স্বামী যতীন্দ্রনন্দজী মহারাজ এবং বৃন্দাবনের বিজয় কৌশলজী মহারাজ।

কুটুম্ব প্রবোধন, ধর্ম জাগরণ, সমরসতা, বিমর্শ, হিন্দু জীবনমূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৩ তারিখ সকালে সকলেই সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীর বাড়ি দর্শন করেন। ১৪ তারিখে মুক্তচিন্তনের পর পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর সমাপ্তি ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

স্বদেশি বার্তা পত্রিকার শিল্পী সাহিত্যিক গুণীজন মিলন

গত ১০ ডিসেম্বর স্বদেশি বার্তা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্ট কবি ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ব্যারাকপুরের সুকান্ত সদনের বিপরীতে ফিয়েস্টা ব্যাঙ্কোয়েট হলে বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় একটি মনোজ্ঞ

সাহিত্য সভা। বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে এই সভাটি পরিণত হয় একটি গুণীজন মিলনে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ, কলকাতা পুরসভার মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মানস সোম, সাহিত্যিক শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সায়ন্তিকা বসু, বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোমক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর লাহিড়ী, স্বদেশি বার্তা পত্রিকার সম্পাদক সৈকত চট্টোপাধ্যায় ও সহ-সম্পাদক তন্ময় নন্দী তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, স্বরচিত সাহিত্য পরিবেশন ও কবিতা পাঠ করেন। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ পূজা সংখ্যাটি সকলের হাতে তুলে দেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কলকাতার দিব্যাঙ্গ ভাই রাষ্ট্রপতি দ্বারা পুরস্কৃত

প্রতি বছর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর) উপলক্ষ্যে মহামহিম রাষ্ট্রপতি দিব্যাঙ্গজন বন্ধুদের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এবছর কলকাতা নিবাসী দিব্যাঙ্গজন বন্ধু (ডাউন সিনড্রোম এবং অটিস্টিক) শ্রীমান রূপাঞ্জন সেন (১৪ বছর) গান, কি-বোর্ড বাজানো, নাচ, অঙ্কন এবং যোগাসনে পারদর্শিতার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর সক্ষম কলকাতা শাখার অয়োজিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে রূপাঞ্জন তার পারদর্শিতা প্রদর্শন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সংগঠনের কলকাতা শাখা তার জন্য গর্বিত এবং তাকে ও তার পরিবারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ব্যবসায়িক সাফল্যে বাসমতীর সুবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পঞ্জাবের আটারি রোডের ওপর একটি গ্রাম হলো খাসা গাঁও। এই গ্রামটি আজ বিশ্ব জুড়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর কারণ হলো এই গ্রামে স্থাপিত একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান— 'সর্বাণী ফুডস্ প্রাইভেট লিমিটেড'। এই কোম্পানিটি বাসমতী চাল তৈরি করে উপসাগরীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করে। এই কারণে রাইস মিল বা চালকল হিসেবে কোম্পানিটি স্থানীয় স্তরে পরিচিতি লাভ করেছে। এই কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ব্রিজভূষণ মিত্তল। তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা, ঠাকুর্দা সবাই ব্যবসায়ী ছিলেন। এই কারণে কর্মজীবনের শুরুতে তাঁকে বড়ো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৭১ সালে ফিরোজপুরে তিনি প্রথম একটি ঘানি বা তেলকল স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে পঞ্জাবের পরিস্থিতির অবনতির দরুন ১৯৮৮ সালে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে তিনি দ্বিতীয় তেল মিলটি স্থাপন করেন। পঞ্জাবের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলে ১৯৯৪ সালে তাঁরা পঞ্জাবে ফিরে আসেন এবং

ফিরোজপুরে চালকলটি স্থাপন করে নতুনভাবে ব্যবসার শুরু করলেন। এরপর অমৃতসরে দ্বিতীয় চালকলটি স্থাপন করেন। গত ৩০ বছর ধরে তিনি বাসমতী চাল উৎপাদন ও রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত।

বাসমতী চাল উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ বস্তা ধান আড়তদারদের থেকে কেনেন। দীর্ঘ সময় ধরে ধান সংগ্রহের এই কাজ চলতে থাকে। এরপরে সংগৃহীত ধান থেকে বাসমতী চাল তৈরির উদ্দেশ্যে একাধিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানায় জাপান নির্মিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি (মেশিন) ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মেশিনগুলির ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য সব রকম কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জনেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী নিযুক্ত। কর্মরত সব শ্রমিকদের পরিশ্রমের দৌলতে প্রতি বছর কোম্পানির মোট ব্যবসার পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ব্রিজভূষণ মিত্তল বলেন, 'গত ৩০ বছরে এই কোম্পানি বহু বার সেই সব সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে যখন মনে হয়েছে যে কোম্পানি হয় তো বন্ধ হয়ে যাবে। ২০১৪-'১৬ সালের মধ্যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার ফলে দেশের ৫০ শতাংশ চালকল বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় আমার কারখানাও প্রবল ক্ষতির মুখে পড়ে। একটা সময় মনে হয়েছিল কারখানা হয়তো সত্যিই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা এবং সহযোগীদের কঠিন পরিশ্রমে সেই যাত্রায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভবপর হয়। এরপরে বড়ো কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।'

ব্রিজভূষণ মিত্তল তাঁর এই সাফল্য ও কৃতিত্ব নিজের পরিবার ও তিন পুত্রের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তাঁর তিন জন পুত্রের মধ্যে ২ জন তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। আরেক জন আমেরিকায় থাকেন। এইসব কিছুর সঙ্গে ব্রিজভূষণ ঈশ্বরের কৃপায় জীবনের যাবতীয় সমস্যা মোকাবিলার সাহস লাভ করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যে কোনো ব্যক্তি কঠিন পরিশ্রমের রাস্তা থেকে সরে না এলে একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু দ্রুত অর্থবান হওয়ার লক্ষ্যে লোকজন অসাধু রাস্তা অবলম্বন করে এবং ব্যবসায়িক উন্নতির ক্ষেত্রে সব রকম সম্ভাবনারহিত ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত হয়।

ব্রিজভূষণ মিত্তল তাঁর উপার্জনের একটি বড়ো অংশ সমাজসেবার উদ্দেশ্যে দান করে থাকেন। তিনি প্রতিনিয়ত মন্দির, গোশালা ও সৎসঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বহু বছর ধরে তিনি রাধাস্বামী সৎসঙ্গের একজন অনুসারী ও ভক্ত। ভক্তিমূলক পরিসরে তাঁর উপলব্ধি হলো যে, মাঝে মধ্যে অবসরে সাধু-সন্তদের সঙ্গলাভে হৃদয়-মন হয়ে ওঠে শান্ত ও পবিত্র। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ায় অসৎসঙ্গ ও খারাপ কাজের হাত থেকে বেঁচে গেছি চির কাল।

কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে, সৎ ভাবে ব্যবসা করে সাফল্য অর্জন করা ধার্মিক ব্যবসায়ী ব্রিজভূষণ মিত্তল নবীন প্রজন্মের সকল ব্যবসায়ীদের কাছে এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। □

বুদ্ধিমান সর্দার

একদল লোক কয়েকশো বলদের পিঠে মাটি চাপিয়ে গুজরাট থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। রাজস্থানে এসে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় অনেক মাটি বিক্রি হয়ে গেল। বলদের পিঠের একদিকের মাটি খালি হয়ে যাওয়ায় বলদগুলির চলতে কষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গের লোকেরা তাদের সর্দারকে জিজ্ঞেস করল এখন কী করা যায়? সর্দার বলল, চিন্তার কিছু নেই। একদিকের খালি থলেগুলোতে বালি ভর্তি করে নাও। লোকেরা তখন খালি থলেতে বালি ভর্তি করে নিল। বলদের পিঠের থলেতে একদিকে মাটি রইল আর একদিকে বালি ভরে নিয়ে তারা রওনা হলো।

দিল্লির প্রায় কাছে তারা যখন এসেছে, তখন একজন লোক বলদের পিঠের থলে থেকে বালি পড়তে দেখে জিজাসা করল, থলেতে বালি কেন? লোকেরা বলল, দু'দিকের ওজন ঠিক রাখার জন্য। আমাদের সর্দার এরকম করতে বলেছে। লোকটি বলল, তোমাদের সর্দারকে বলিহারি। বলদের পিঠে খামোকা ভার চাপিয়ে জীবগুলোকে কষ্ট দেওয়া আর কী! মাটিগুলোই তো আধাআধি করে একদিকের থলেতে চাপালেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। লোকেরা বলল, আমাদের তো সর্দারের কথা শুনতে হবে। তবু লোকটিকে তারা সর্দারের কাছে নিয়ে গেল। সর্দার জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় থাকেন আর কী করেন? লোকটি বলল, আমি হরিয়ানায় থাকি। রোজগারের আশায় দিল্লি গিয়েছিলাম। কিছুদিন থাকার পর অসুখে পড়ে গেলাম। যা রোজগার করেছিলেম সবই খরচ হয়ে গেল। হাতে কিছুই রইল না। তাই চিন্তা করে দেখলাম বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো।

লোকটির কথা শুনে সর্দার তার লোকেদের বলল, এর কথা শুনে লাভ নেই। যেমন আমরা যাচ্ছি তেমনই চলো। এর কথা ভালো হলেও ফল ভালো হয়নি। ওর বুদ্ধি যদি ভালো হতো তাহলে তো রোজগার করতে পারত। আমি আমার কাজে কখনোও লোকসান খাইনি। আবার তারা রওনা হলো।

এক সময় তারা বলদের দল নিয়ে দিল্লি পৌঁছে গেল। সেখানে সর্দার একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে মাটি আর বালি আলাদা করে রাখল। সঙ্গের লোকেদের বলদগুলোকে দিল্লির বাইরে নিয়ে গিয়ে ঘাস ও জল খাওয়াতে বলল। এদিকে প্রায় সব মাটিই বিক্রি হয়ে গেল, কিছু পড়ে রইল।

এই সময় দিল্লির বাদশা কঠিন অসুখে পড়েছেন। হেকিম পরামর্শ দিয়েছে, বাদশাকে কয়েকদিন রাজস্থানে গিয়ে বালির ওপর শুয়ে থাকলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। উজির সাহেব বললে, রাজস্থানে পাঠাবার প্রয়োজন নাই। ওখান থেকে বালি নিয়ে এলেই তো হয়। একজন বললে,দিল্লির বাজারেই রাজস্থানের বালি পাওয়া যাচ্ছে।

বাদশাহের লোক ওই সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, বালির কী দাম? সর্দার বললে, মাটি নাও আর বালি, এক দাম। কেননা দুটিই বলদের পিঠে করে আনতে হয়েছে। বাদশাদের লোকেরা সমস্ত বালি কিনে নিয়ে গেল। মাটি যেটুকু ছিল তাও বিক্রি হয়ে গেল।

ছোটো বন্ধুরা, সর্দার যদি ওই লোকটির কথা শুনত তাহলে কি সে এত লাভ করতে পারত? যে নিজে উন্নতি করতে পারেনি, যার বুদ্ধির বিকাশ হয়নি, তার পরামর্শ নেওয়া ঠিক নয়। যিনি জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, যিনি বুদ্ধিমান, তাঁরই পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। সর্দারের ভাবনাই ঠিক ছিল।

গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

বীর বনবাসী

হাইপো জাদোনাংগ

জন্ম ১৯০৫ সালে মণিপুরে। তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব তথা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। ভারতকে ব্রিটিশ মুক্ত করতে তিনিও মণিপুরে নাগা জনজাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। নাগা জনজাতিদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এবং স্বধর্ম রক্ষা করতে হেরাকা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি নিজেকে নাগাদের রাজা বলে ঘোষিত করেন। তারজন্য সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে পুরুষ ও মহিলা দুই-ই ছিলেন। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ শাসক তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও প্রবল জনরোষে মুক্ত করতে বাধ্য হয়। ১৯৩১ সালে পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ২৯ আগস্ট ফাঁসি দেয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩

(পুংলিঙ্গে)

সঃ কঃ— সে কে?

সঃ বালকঃ— সে বালক।

সঃ যুবকঃ। সঃ গায়কঃ। সঃ পণ্ডিতঃ। সঃ পুরুষঃ। সঃ আরক্ষকঃ। সঃ দেবঃ। সঃ লেখকঃ।

অভ্যাস করি—

রাকেশঃ, রাজেশঃ, চন্দনঃ, বিশালঃ, বিবেকঃ, মদনঃ, মাধবঃ, কৌশিকঃ, সৌমেনঃ, চিকিৎসকঃ, দেশভক্তঃ, গায়কঃ, পরীক্ষকঃ, কুম্ভকারঃ, কর্মকারঃ।

এভাবে বলতে হবে।

ভালো কথা

দাদুর কথা ঠিক

কয়েকদিন আগে আমি মায়ের সঙ্গে দিল্লি থেকে পূর্বা এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম। আউটারে এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-সাতটি বাচ্চা ট্রেনে উঠে সবার কাছে গিয়ে 'ভুখ লগা হ্যায়, পয়সা দিজিয়ে' বলতে লাগল। কেউ দিচ্ছে, আবার কেউ মুখ ফিরিয়ে থাকছে। একসময় আমার কাছেও এল। আমি পার্স থেকে টাকা বের করে দিতে যাব এমন সময় পাশে বসা এক দাদু বললেন, দিদিভাই টাকা দেবে না, তোমার কাছে যদি খাবার কিছু থাকে তাহলে দাও। আমি টাকা রেখে টিফিন বক্স থেকে পরোটা বের করে দিতে যাব, ওরা বলল রোটি নহী চাহিয়ে, রুপয়া দিজিয়ে। দাদু সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে বললেন, ভাগো হিঁয়াসে। ওরা চলে গেল। দাদু বললেন, ওদের কখনো টাকা দেবে না। টাকা দিয়ে ওরা নেশার জিনিস কিনে খাবে। বড়ো হয়ে সমাজবিরোধী হবে। আমি ভেবে দেখলাম দাদুর কথা একেবারে ঠিক।

দেবযানী বিশ্বাস , দ্বাদশ শ্রেণী, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত স্মি স্য	(১) ন দ্ম শ লা লো প প চ
(২) রু ব দ্ধ	(২) মা ম রা রি চ ত স ন

১১ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অরুণোদয় (২) অসহযোগ

১১ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) কাবুলিওয়ালা (২) কায়দাকানুন

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌভিক শর্মা পুরকায়স্থ, রবীন্দ্রনগর, কোচবিহার। (২) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪। (৩) অরিত্র দাস, বোলপুর, বীরভূম। (৪) বিদিশা হালদার, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী

আনন্দ মোহন দাস

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একজন বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। তিনি বহু গুণে গুণান্বিত এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কুশলী রাজনীতিবিদ, সুবক্তা এবং দক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান। তাঁর জন্মদিনের স্মৃতিচারণায় এই মহান ব্যক্তিত্বের অনেক ঘটনাই স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। এই বিশাল ব্যক্তিত্বকে কয়েক পৃষ্ঠায় বেঁধে রাখা খুবই কঠিন কাজ। তাই তাঁর জীবনের কয়েক ঝলক তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর স্কুল জীবন শুরু করেছিলেন গোয়ালিয়রের গ্রামের স্কুলে। বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে দেশাত্মবোধের বীজ বপন হয়েছিল। সেখানেই তিনি দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার সেবা করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তা প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর জীবনশৈলীতে। শিক্ষা সমাপ্ত করে সঙ্ঘের প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছেন। 'ম্যঁয় রহুঁ না রহুঁ, ভারত রহেনা চাহিয়ে' এই মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত ছিলেন। ভারতের কল্যাণ এবং মানব সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রমাণ করে তিনি 'Plain living and high thinking' তত্ত্বে বিশ্বাস রাখতেন।

জীবনের প্রথম দিকে বাজপেয়ী কয়েকটি পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজও করেছেন, যথা রাষ্ট্রধর্ম, বীর অর্জুন, স্বরাজ এবং পাঞ্চজন্য পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। কবি হিসেবে তাঁর রচিত কবিতা আজও মনকে আলোড়িত করে। যেমন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গীত নয়া গাতা হুঁ" এবং তাঁর কয়েকটি হিন্দি কবিতার বইও রয়েছে। কিন্তু তিনি নিজের জীবনকে কেবলমাত্র কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি।

পরবর্তীকালে তিনি বৃহত্তর স্বার্থে সঙ্ঘের যোজনায় রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগ দেন। একসময় তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আপ্তসহায়ক হিসেবেও কাজ করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রসম ব্যক্তি ছিলেন। রাজনীতির হাতেখড়ি থেকেই নিজগুণে তিনি এই ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিলেন। সেই যুগে ভারতীয় জনসঙ্ঘে তিন জনের এক অনবদ্য জুটি ছিল যাঁরা ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে দলকে প্রাথমিক অবস্থা থেকে দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন, বলরাজ মাধোক, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও অটলবিহারী বাজপেয়ী। অকৃতদার বাজপেয়ীর ব্যবহার কুশলতার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সেজন্য সংসদে বিতর্কে অংশ নিয়ে বিরোধী নেতারা প্রায়শ বলতেন, বাজপেয়ী লোক ভালো কিন্তু তাঁর দল বিজেপি ভালো নয়। কিন্তু বাজপেয়ী বুদ্ধিদীপ্ত জবাবে বলতেন গাছ ভালো না হলে ফল কী করে ভালো হয়? সেজন্য বিরোধীদের দাবির কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে বলতেন মা সরস্বতী যেন তাঁর জিহ্বার ডগায় অবস্থান করছেন। সংসদে বিরোধীরা বাজপেয়ীর তথ্যপূর্ণ মনমুগ্ধকর ভাষণ শুনে মোহিত হয়ে যেতেন।

১৯৫৭ সালে বাজপেয়ী উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর থেকে প্রথম সাংসদ হন এবং জওহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তখন বাজপেয়ী বারবার জম্মু-কাশ্মীরে সফর করতেন এবং ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবিতে সংসদে জোরালো দাবি করতেন। সেজন্য নেহরু বাজপেয়ীর উপর বিরক্তবোধ করলেও কিন্তু তাঁর প্রখর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হতেন। নেহরুর আমল থেকেই তিনি সংসদে জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরকার পক্ষকে যুক্তির বেড়াজালে নাস্তানাবুদ করতেন। একবার বিতর্কে অংশ নিয়ে সংসদে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নেহরুকে দোহরা

চরিত্রের মানুষ বলে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, তিনি একাধারে চার্চিলও বটে, আবার অন্যদিকে চেম্বারলেনও বটে। প্রথমবারের তরুণ সাংসদের সংসদীয় দক্ষতা ও বাগ্মিতার তারিফ করে নেহরু বাজপেয়ীকে 'ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় নেহরু কোনো এক ব্যাংকোয়েট হলে বাজপেয়ীকে দেখে তাঁর সেদিনের ওজস্বী ভাষণের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সংসদে তাঁর ভাষণশৈলীর মাধ্যমে সকলকে মনমুগ্ধ করে দিতেন। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য বিরোধীরা অপেক্ষা করে থাকতেন। সংসদে তাঁর বিরোধিতা করার মতো সাহস খুব কম সাংসদেরই ছিল। দলমত নির্বিশেষে তাঁর সংসদীয় দক্ষতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারতেন না। তাঁর ক্ষুরধার ভাষণে বিরোধীদের কুপোকাত করে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি সাংসদ ছিলেন। আজকের দিনে তাঁর মতো বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাংসদের অভাব বারবার অনুভূত হয়। তিনি কেবলমাত্র দক্ষ সাংসদ ছিলেন না, তাঁর মধ্যে মানবিকতা ও সৌজন্যবোধ পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি বিপক্ষ দলের নেতাদের কীরকম সম্মান করতেন তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। তিনি বিদেশমন্ত্রী হিসেবে যখন সাউথ ব্লকে পৌঁছে দেখেন ক্ষমতার পরিবর্তনে নেহরুর একটি ছবি সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশে আবার সেই ছবি আগের জায়গায় ফিরে এসেছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকের দিনে এই ধরনের সৌজন্যবোধ খুবই বিরল। সেই কারণে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই বাজপেয়ীর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। তাঁর ফলে তিনি অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছর এনডিএ জোটের সরকার চালিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় রাজনৈতিক মহলে অটলবিহারী বাজপেয়ী ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু লালকৃষ্ণ আদবানির জুটিকে শ্রেষ্ঠ জুটি হিসেবে দেখা হতো। এই জুটিই কঠিন সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বের বীজ বপন করে গেছেন যা আজ মহীরুহে পরিণত। সেজন্য ভারতবাসী হিসেবে সকলেই বর্তমান রাজনীতিতে এদের গুরুত্ব অনুভব করেন। ১৯৭৫ সালে স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারির বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দলকে একত্রিত করার পিছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। সমস্ত দলকে নিয়ে জনতা পার্টি গঠন এবং সরকার গঠনেও তাঁর ভূমিকাকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না।

১৯৮৪ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর লোকসভা নির্বাচনে সহানুভূতির ঢেউয়ে কংগ্রেস দল যখন একাই ৪০৩টি আসন পেল, তখন বিজেপি মাত্র দুটি আসনে জয়লাভ করল। তার ফলে কর্মীদের মনোবলকে উজ্জীবিত করতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন অন্ধকার দূর হবে, সূর্য উদয় হবে। তিনি দূরদর্শী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়েছে, বিজেপি দুই থেকে দুশো হয়েছে এবং বর্তমানে ৩০০ জনের বেশি এমপি নিয়ে প্রায় দশ বছর দল কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে। আজ ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই দলের সরকার রয়েছে।

তাঁর কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সংগঠন ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই দলকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা যে স্বভাষা, স্ব-ভূষা ও স্বদেশীর কথা বলে থাকি তা অটলজী নিজের জীবনে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন এবং ভারতবাসীকে গর্বিত করেছিলেন। বিশ্বের কাছে আমাদের নিজেদের ভাষা নিয়ে স্বাভিমানবোধকে জাগ্রত করেছিলেন। অর্থাৎ 'স্ব'-এর ব্যবহারকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

তিনি জনতা সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সফল ছিলেন এবং সেই সময়ে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক মজবুত ছিল। তাঁর এই দক্ষতাকে সম্মান জানিয়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও ১৯৮৫ সালে জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের বিশেষ অধিবেশনে বিরোধী নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এমনকী নরসীমা রাও এ বিষয়ে কংগ্রেস দলের আপত্তিকে জোরালোভাবে অস্বীকার করেছিলেন। সেই বিশেষ অধিবেশনে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগটি জোরালোভাবে উত্থাপন করার প্রস্তাব রেখেছিল, যার তীব্র বিরোধিতা করতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও ভারত সরকারের পক্ষে উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য নিজে না গিয়ে বাজপেয়ীর উপর ভরসা রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে বাজপেয়ী তা দক্ষতার সঙ্গে ভারতের পক্ষ রেখেছিলেন। একজন বিরোধী নেতা সরকার পক্ষের হয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পাকিস্তানের অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা শুনে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

তিনি একমাত্র অকংগ্রেসি ব্যক্তি যিনি তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ১৩ দিনের সরকারই ভারতবর্ষে সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল। সেবার একক বৃহত্তম দল হিসেবে বিজেপিকে সরকার গঠন করতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মা সংসদীয় দলের প্রধান হিসেবে অটলবিহারী বাজপেয়ীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজপেয়ী অন্য দলের সমর্থন না পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে বিজেপিকে অচ্ছুত করে রাখার বিরুদ্ধে তিনি সংসদে আস্থা প্রস্তাবের উপর যে মর্মস্পর্শী বক্তব্য রেখেছিলেন আজও তা সংসদীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপরের নির্বাচনে জোটের বাধ্যবাধকতায় তাঁর নেতৃত্বে জোট সরকারের মেয়াদ ছিল ১৩ মাস।

এরপর ১৯৯৯ সালে তিনিই প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচবছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে তাঁর শাসনকালে দেশকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পোখরান-২ নামে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। বিদেশি শক্তির সমস্ত অর্থনৈতিক বাধা উপেক্ষা করে ভারতকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯৯৯ সালে দেশের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে ভারতকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারতের অর্থনীতি অনেক মজবুত ছিল এবং সড়ক নির্মাণে তাঁর পরিকল্পিত স্বর্ণ চতুর্ভুজ প্রকল্প হাইওয়ে নির্মাণে দিগন্ত খুলে গিয়েছিল। তাঁর আমলেই ২০০০ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা চালু হয়েছিল, যার মাধ্যমে আজও ব্যাপকভাবে গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ হয়ে চলেছে। তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি পরিকাঠামোগত শিল্পে অনেক বেশি জোর দিয়েছিলেন, যার ফলে আজকের দিনে রাস্তাঘাট নির্মাণে দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় রাজনীতিতে এক যুগের অবসান ঘটেছে যা সহজে পূরণ হবার নয়। □

বালুরঘাট থেকে আজিমগঞ্জ যাত্রী সাধারণের দাবি মুর্শিদাবাদ-শিয়ালদা পর্যন্ত ট্রেন চাই

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভারতে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ও আরামদায়ক মাধ্যম হলো রেলপথ। মাকড়সার জালের মতো সারা দেশে এই রেলপথ বিছিয়ে রয়েছে। প্রতিনিয়ত দেশের কোথাও না কোথাও হয় নতুন রেলপথ তৈরি হচ্ছে, নয়তো কোথাও রেলপথ বর্ধিত হচ্ছে, কোথাও-বা এ রেলপথ থেকে অন্য রেলপথে সংযুক্তি চলছে। এমনই এক রেলপথ সংযুক্তির কাজ শেষ হলো সম্প্রতি। মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ জংশন থেকে গঙ্গার উপর নসিপুর ব্রিজ পার হয়ে মুর্শিদাবাদ স্টেশন পর্যন্ত। মুর্শিদাবাদ স্টেশনটি লালগোলা-শিয়ালদা রুটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মানুষ দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গার পূর্বপারে মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখতে এবং সরকারি-বেসরকারি কাজে যান, হয় বাসে নয়তো ট্রেনে আজিমগঞ্জ নেমে গঙ্গা পেরিয়ে জিয়াগঞ্জ থেকে বাসে বা ট্রেনে। তেমনি দক্ষিমবঙ্গের ওই সমস্ত এলাকার মানুষদের উত্তরবঙ্গে আসতে অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়। এই রেল সংযুক্তির ফলে সেই দুর্ভোগ থেকে মানুষ এখন নিস্তার পাবেন।

মালদহ থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য বহু ট্রেন ররেছে, সেগুলোর মধ্যে কোনোটা আজিমগঞ্জ, কাটোয়া হয়ে হাওড়া অথবা শিয়ালদা যায়। আবার বহু ট্রেন রামপুরহাট, বোলপুর, বর্ধমান হয়ে হাওড়া অথবা শিয়ালদা যায়। আজিমগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ রেলসংযুক্তির ফলে মালদহ থেকে আজিমগঞ্জ হয়ে মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর-কৃষ্ণনগর- রাণাঘাট, শিয়ালদা থেকে একদিকে যেমন সময় কম লাগবে তেমনি ভাড়াও কম হবে। ঠিক একইভাবে বালুরঘাট-গঙ্গারামপুর-বুনিয়াদপুর- গাজোল এবং অন্যান্য গ্রাম থেকেও বহু মানুষ মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, নৈহাটি প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেন। তাঁদের সুবিধার জন্য বালুরঘাট থেকে সালে আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ হয়ে একখানা ট্রেন শিয়ালদা পর্যন্ত দিলে এবং পুনরায় সেটি বালুরঘাট ফিরে এলে এই এলাকার যাত্রীসাধারণের প্রভূত উপকার হবে।

ইতিমধ্যে পূর্বরেল ঘোষণা করেছে, রাণাঘাট থেকে সকাল ৬-৩০ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১২-২০ মিনিটে মালদহ টাউন একটি ডেমু ট্রেন পৌঁছবে। এই ট্রেনটি পুনরায় দুপুর ১টায় মালদহ থেকে ছেড়ে সন্ধ্যা ৬টায় রাণাঘাট পৌঁছবে। তেমনিভাবে অন্য একটি ট্রেন সকাল ৬-৪০ মিনিটে মালদহ থেকে ছেড়ে দুপুর ১২-৩০ মিনিটে রাণাঘাট পৌঁছবে। পুনরায় সেটি বেলা ২-৫০ মিনিটে রাণাঘাট থেকে ছেড়ে রাত ৮-৩০ মিনিটে মালদহে পৌঁছবে। কিন্তু এই ট্রেন দুটি মালদহ-বালুরঘাট রুটের যাত্রীদের কোনো উপকারে লাগবে না।

কাজেই বালুরঘাট থেকে আজিমগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ হয়ে শিয়ালদা যাওয়া যাত্রীদের সুবিধার্থে রাণাঘাট থেকে ছাড়া ডেমু ট্রেনটির সময়ের পরিবর্তন করে বালুরঘাট পর্যন্ত বর্ধিত করা হোক। নতুবা সকালে বালুরঘাট থেকে রাণাঘাট কিংবা কৃষ্ণনগর সিটি জংশন পর্যন্ত ডেমু ট্রেন দেওয়া হোক। অথবা বালুরঘাট থেকে সকালে যে তেভাগা ট্রেনটি রামপুরহাট, বর্ধমান হয়ে কলকাতা যায় সেই ট্রেনটির যাত্রাপথ বদল করে আজিমগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ হয়ে শিয়ালদা বা কলকাতা স্টেশনে দেওয়া হোক।

বালুরঘাট-মালদা রুটে যাত্রীদের প্রয়োজন এবং সময়ের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে রেলযাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রেলপবিহণের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে উপরোক্ত মতামত সমূহ গ্রহণ করে রেলের উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এই আশা বালুরঘাটবাসী করে। □

রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ভারতীয় ইতিহাসকে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছে

পিন্টু সান্যাল

প্রথম পর্ব

রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রামমন্দিরের পুনরুদ্ধারের জন্য যেমন সমাজ জাগরণের অর্থাৎ শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসের দীর্ঘতম লড়াইয়ে রামমন্দিরের প্রতি হিন্দুদের আস্থা ও ঐতিহাসিকতার প্রমাণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই দুই দিকেই মন্দিরের বিপক্ষে থাকা কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক, সাংবাদিকদের বৌদ্ধিক লড়াইয়ে হার স্বীকার করতে হয়েছে। একদিকে সমাজকে বিভ্রান্ত করতে সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শ্রীরামের গুরুত্বকে লঘু করা আর তার সঙ্গে বিচারাধীন মামলাকে মিথ্যা ইতিহাসের ঘুরপাকে আবদ্ধ রাখতে কমিউনিস্টদের চেষ্টার খামতি ছিল না।

মন্দির শুধু উপাসনাকেন্দ্র নয়, ভারতীয় ইতিহাসের, ভারতীয় সমাজের মনস্তত্ত্বের চিত্রণ। রামমন্দির ধ্বংস করা শুধু ভারতীয় তথা পৃথিবীর প্রাচীনতম উপাসনার উপর আঘাত নয়, ভারতীয় ইতিহাসের ওপর আঘাত। শ্রীরাম আর রামজন্মভূমিতে রামমন্দিরের অস্তিত্বের প্রতি যারা সমাজে সংশয় তৈরি করতে চেয়েছে তারা ভারতের শুভচিন্তক হতে পারে না।

শ্রীরাম ভারতবর্ষীয় ধর্মের বাস্তবিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রামকথা শুনিয়েই শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাদান শুরু করেছিলেন। বিশ্বকবির কথায়—

'রামায়ণ সেই অখণ্ড-অমৃত-পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে' (রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য)।

শ্রীরামকে যদি কাল্পনিক বলা হয় তাহলে শুধু ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে আঘাত করা নয়; সত্য রক্ষার্থে মানবের ত্যাগের সীমা, অশুভকে পরাস্ত করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক জাগরণের উচ্চতম নিদর্শনের বাস্তবিকতাকে অস্বীকার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতাত্ত্বিকরা যে আদর্শ সমাজের ও সুরাজের কল্পনা করেছিলেন, রামরাজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষেই তার বাস্তবায়ন হয়েছে। 'রামরাজ্য' বাস্তবিক হলে সাম্যবাদের অসার তত্ত্ব গেলানো কঠিন হয়ে যায়।

রামকথা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজের প্রত্যেক অংশে গার্হস্থ্য জীবনের যে মূল্যবোধ শিখিয়েছে, যার ফলে ভারতীয় সমাজ সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতার অভ্যাস করাকে রামভক্তির সমার্থক মনে করেছে; সেই অভ্যাস থেকে সমাজকে সরিয়ে দিয়ে ইউরোপীয় বস্তুবাদী চিন্তা ও অভ্যাস দিয়ে ভারতীয় মনোভূমিতে আঘাত করার প্রয়াস হয়েছে।

সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে মর্যাদার সীমাকে চিহ্নিত করে যাঁর জীবন তিনিই 'মর্যাদা পুরুষোত্তম'। সেই মর্যাদা না থাকলে পাশবিক প্রবৃত্তির বশে প্রাণীর বংশবিস্তার হতে পারে কিন্তু সভ্যতার সৃষ্টি হয় না। ভারতীয় পরিবারকেও যারা শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে বিভাজনের স্বপ্ন এখনো দেখছে, তাদের কাছে রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ আপন তত্ত্বকে চুরমার হতে দেখা।

মন্দিরের ওপরে অত্যাচারী বিদেশি শাসকের সৌধ নির্মাণ ভারতীয় মনে দাসত্ব গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা। অস্ত্রের আঘাত দেহকে ধ্বংস করেছে কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিকে নয়। ভক্তির দ্বারা যে মনোবল জন্মায় তা থেকেই ভক্তির কেন্দ্র উদ্ধারের শক্তি জন্মায়।

সন্ত কবি তুলসীদাস মধ্যযুগে ভক্তিকে বাঁচিয়েছিলেন। শ্রীরামকে কাল্পনিক বলে ভক্তি থেকে সরিয়ে সমাজকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা দেখিয়েছে একটা গোষ্ঠী। শ্রীরাম বাঙ্গালির দেবতা না বিহারির দেবতা, ভক্তির দেবতা না যুদ্ধের দেবতা, এই নিয়ে অযৌক্তিক আলোচনা করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় মানসে অবিশ্বাস আর সন্দেহ ভরে দেওয়ার চেষ্টা নতুন নয়।

ভারতের অনন্যতা তার পরিবার ব্যবস্থায় আর পরিবার ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে দাম্পত্য জীবন। সীতা-রাম জুটি দাম্পত্য জীবনকে ধর্মের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই দাম্পত্য জীবনের বাধা রাবণকে পরাজিত করেই পরিবারের রক্ষা সম্ভব। পরিবার হলো সমাজের একক।

পরিবার বাঁচলে সমাজ বাঁচবে। যারা সমাজকেও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছে তারা ভারতীয় সমাজকে বুঝতে ব্যর্থ। ধর্মের বন্ধনকে ছিন্ন করে তারা যেমন ভারতীয় সমাজকে ভাঙতে চেষ্টা করছে, আবার সমাজের আধার ভারতীয় পরিবারের আদর্শ কর্তা রামকে ভুলিয়ে দিয়ে ভারতের বৈশিষ্ট্যের মূলে আঘাত করতে চায়। মার্কসবাদের দৃষ্টিতে পরিবারেও শোষক-শোষিতের সম্পর্ক দেখতে পায় কমিউনিজমের সমর্থকরা। পরিবার, রাষ্ট্র তাদের কাছে শোষণের যন্ত্র। রামমন্দির নির্মাণ ভারতীয় পরিবার ও রাষ্ট্রের ধারণাকে পুষ্ট করে বলেই তা 'রাষ্ট্রমন্দির'।

ইতিহাসকে বিকৃত করে আর সমাজের আদর্শকে ভুলিয়ে দিয়েই ভারতের মনোভূমিতে বিদেশি মতবাদের ধাঁচা নির্মাণের সম্ভাবনা দেখেছিল শ্রেণী সংগ্রামের সমর্থকরা আর সমাজের মন থেকে অর্থকেন্দ্রিক দর্শনের ধাঁচাকে গুড়িয়ে দিতেই রামমন্দিরের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন ছিল। পিতৃসত্য রক্ষার্থে ভাইকে রাজসিংহাসন দিয়ে চোদ্দ বছর বনবাসে যাওয়া শ্রীরামচন্দ্র তাদের কাছে কাল্পনিক মনে হবে যারা পৃথিবীর ইতিহাসকে কেবল আর্থিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছে। ভারতীয় ইতিহাস লিখনের পরম্পরা শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ নয়, ঘটনাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সমাজের পক্ষে হিতকর ভঙ্গীতে উপস্থাপন। পশ্চিমি সভ্যতা শুধু ঘটনার বিবরণ চায়। তাই ইতিহাসের কাব্যরূপের বিভিন্ন রূপকে তারা বিভ্রান্ত। রামকথার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাস যেরকম জীবন্ত, পৃথিবীর আর কোথাও তা কল্পনার অতীত।

যাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাজ্য দখল ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিকে উপড়ে ফেলা; যাদের ধ্বংসলীলার চিহ্ন আজও বহন করে চলেছে মথুরা, কাশী, তাদের নামে এদেশের রাজপথ, বাগান, শহর নামাঙ্কিত করার নামই কি 'সেকুলারিজম' (বি: দ্র:--- সেক্যুলারিজমের অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা নয়)? ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই মুঘল, লোদি, তুঘলকদের মহান বানিয়েছে কারা?

কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা বরাবর মুঘলদের কীর্তিকে মহান করে দেখিয়েছেন। ইংরেজ আমলে ইংরেজদের লেখা ভারতবর্ষের ভুল ইতিহাস দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের দুঃস্বপ্নের কাহিনিমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলে, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে--- পাঠান-মুঘল পর্তুগীজ-ফরাসি-ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।' তাহলে ইতিহাস লেখার দৃষ্টিকোণ কীরকম হওয়া উচিত? কবিগুরু লুটেরাদের, বিদেশিদের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ভারতবর্ষের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত ইতিহাস চেয়েছেন—

'আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি; বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না আগন্তুকবর্গই যেন সব'।

যে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা শেখালেন মুঘলরাই এদেশে স্থাপত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে; কবিগুরুর সেই কথাগুলো কি আজও তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়? 'এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না— ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং এখন আমাদিগকে অশন-বসন, আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশির কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।' ইতিহাসে বিদেশিদের বড়ো করে দেখলে স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়ে আর তারপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিদেশি তত্ত্বের জায়গা পাকা করতে সুবিধা হয় বলেই কি এরকম অপচেষ্টা হয়েছে দশকের পর দশক?

তারপর এই দেশের শিকড়ে প্রাণের রস সঞ্চার করেছিলেন যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁদের ভুলিয়ে দিয়ে অফিসে, বাড়িতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যুবকদের টি শার্টে বিদেশীয়দের ছবি জায়গা পায় স্বদেশি মহাপুরুষদের স্থানে। তখন স্বদেশের সবকিছুকেই বদলে ফেলে বিদেশের ছাঁচে তৈরি কতে চায় যুবক মন— এই কি ইতিহাসকে ব্যবহার করে আধুনিক যুগে বিদেশীয় মতবাদের ক্ষমতায়নের ব্লু প্রিন্ট? 'ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া' যারা নকল ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনা করে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিকের উপাধি ধারণ করে লুটেরাদের নায়কের আসন দিয়ে দেশরক্ষায় প্রাণ বলিদান দেওয়া রাণা প্রতাপ, রানি দুর্গাবতীকে আড়ালেই রেখে দিলেন, তাদের কৃত্রিম জ্ঞান 'এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।' ক্ষতি অনেক হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি এবং নিজে খর্ব হইতেছি।'

রামজন্মভুমি মামলার রায় কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভারতকে খর্ব করার অপচেষ্টার 'শেষের শুরু'। দেশগঠনে ইতিহাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর ইতিহাসকে বিদেশীয় মতবাদের জন্য জায়গা করে দিতে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করতে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই ষড়যন্ত্রকে সর্বসমক্ষে এনে দিয়েছে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

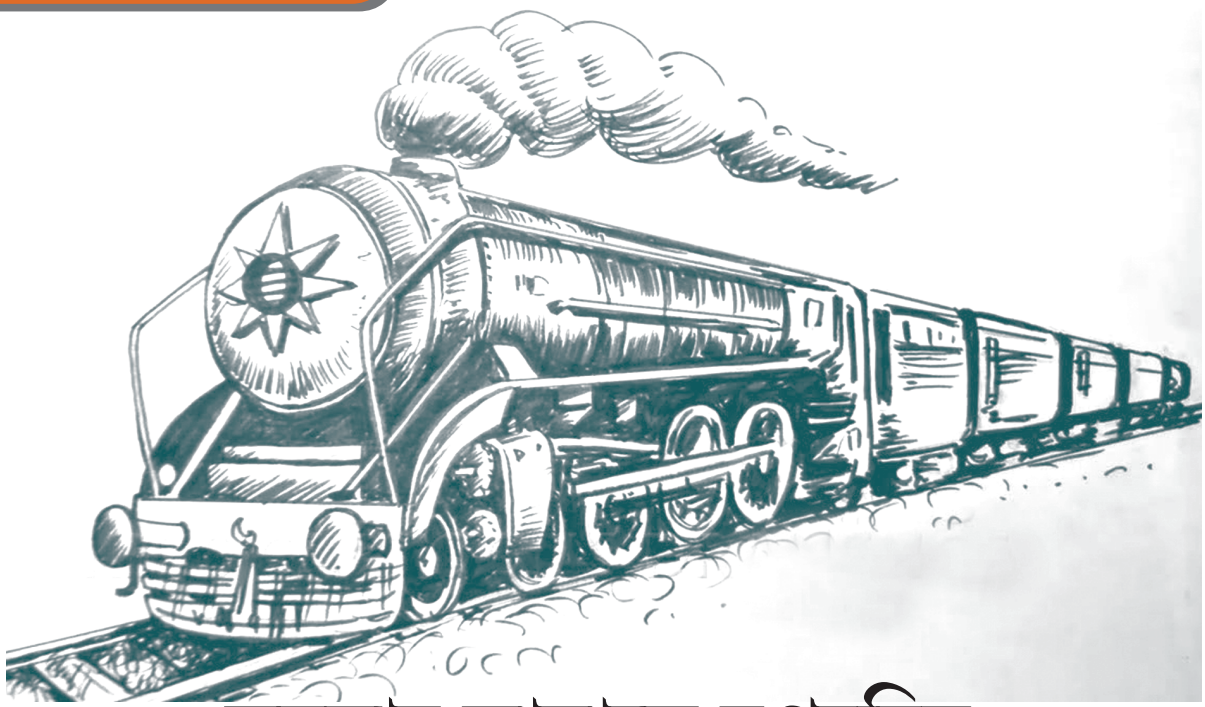

ভদ্রতার আড়ালে নগ্নচরিত্র

শেফালী সরকার

অতীতের স্মৃতির পাতা হতে মুছে দিতে চাইলেও কেন জানি মুছে দিতে পারি না। সেদিনের সেই দুঃখের কথা মনে হলে আজও তার সঠিক উত্তর পাই না।

ছোটোবেলাতে মা'র মুখে গল্প শুনেছি, লোভ মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের চরিত্রই হলো তার চেহারা। মুখের মধুর কথা শুনে কোনো মানুষকে চেনা যায় না। আমরা এক শিক্ষিত সমাজে বসবাস করি। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ বলতে কী বোঝায় তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে তার একটি চরিত্র আছে। সেটা লেখাপড়া অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি দিয়ে যাচাই কারা যায় না। সংসারে এমনও লোক আছেন যারা ইউনিভার্সিটি তো দূরের কথা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেও পরিচিত নয়, অথচ মনুষ্য জীবনের যথাযথ জ্ঞান তাঁদের আছে। মানুষ হিসেবে তাঁর আচার আচরণ, অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি কী প্রকারের ব্যবহার করা উচিত তার সম্পূর্ণ জ্ঞান তাদের আছে। তাঁরা আমার দৃষ্টিতে যথার্থই মানুষ; অথচ শিক্ষিতের তকমা লাগিয়ে পশুর আচরণ যাদের, তাদের কী করে মানুষ বলা হয় তাই ভাবি!

এসব লেখার একটাই অর্থ, একটি ঘটনা আমার মনে ভীষণভাবে আঘাত দিয়ে গেছে। সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধানে অনেক কিছুই ভুলে গেছি— তবে যেটুকু আজও মনকে আলোড়িত করে তাই শেয়ার করছি। সেদিন ছিল ১৯৮০ সালের জুলাই মাস। তারিখটা ঠিক মনে পড়ছে না। শুধুমাত্র সামান্য একটু যা মনে পড়ছে তাই লিখে যাচ্ছি।

প্রচণ্ড গরম হাওয়া চারিদিকে বইছে। প্রকৃতির সঙ্গে শহরের পরিস্থিতিও তেমনি উত্তপ্ত। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। চারিদিকে শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।

অসমে ভাষা আন্দোলন জোরকদমে শুরু হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

ভাষা হলো মানুষের অতি আদরের ও সম্মানের বিষয়। ভাষার মাধ্যমে একের সঙ্গে অন্যের প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার বিনিময় হয়। ভাষা জোর করে কাউকে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হাজার হাজার লোকের প্রাণের বিনিময়ে, লক্ষাধিক লোকের রক্তের বিনিময়ে, সহস্রাধিক লোককে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অন্ন-বস্ত্রহীন করে পথে নামানো কোনোমতেই সমীচীন নয়।

ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। দেখতে পেলাম মনুষ্য জীবনের এক অদ্ভুত নগ্ন চরিত্র। আমার স্বামী একজন ডাক্তার। তিনি নিজস্ব কাজে কিছুদিনের জন্যে দেশের বাইরে গিয়েছেন। আমি ছোটো দুটি বাচ্চাকে নিয়ে গুয়াহাটির বাড়িতে থাকি। খুব সহজ সরল ও সুন্দরভাবে আমাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। প্রতিবেশীরা সব সময়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন; যার ফলে নিজেকে কখনও একা অনুভব করিনি।

যখন চারিদিকের পরিস্থিতি দিনে দিনে ভীষণ ভয়াবহ হতে লাগলো, তখন আমার স্বামীর নিকট হতে খবর এলো আমি যেন বাচ্চাদের নিয়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাড়িতে এসে থেকে যাই।

তাঁর কথামতো আমরা কলকাতা যাওয়া স্থির করে নিলাম।

প্রতিবেশী এক ভাইকে সঙ্গী করে বাচ্চাদের নিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেসে যাত্রা করলাম। সঙ্গে চলার মতো কিছু জিনিস, দুটি ট্রাঙ্ক ও দুটি ব্যাগ, ট্রেন সফরকালে বাচ্চা সঙ্গে থাকলে যা প্রয়োজন হতে পারে— তার বাইরে অন্য কিছুই নয়।

ট্রেনে ভীষণ ভিড়। রিজার্ভেশন থাকলেও সাধারণ যাত্রীরাও উঠে পড়েছিল। ট্রেন যথাসময়ে গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ছেড়েছিল। রেলের আরপিএফ স্টাফ তাদের কর্তব্যকর্ম মতো যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করছে। ক্রমে আমার কাছে এসেই জানতে চাইলো ট্রাঙ্ক দুটো কার? এতে কী আছে দেখতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে টিকিট দেখিয়ে বললাম— এই ট্রাঙ্ক দুটো আমার, এই যে খুলে দেখাচ্ছি। এভাবে যাত্রীদের একটু সরিয়ে বাচ্চা কোলে করেই ট্রাঙ্ক খুলতে যাবো— এমন সময়ে একজন আরপিএফ ভদ্রভাবে আমাকে বললো ট্রাঙ্ক খুলতে হবে না। এত ভিড়, শুধু জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাচ্ছেন, সঙ্গে কে আছে ইত্যাদি।

আমিও তাঁদের যথাযথ ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন আরপিএফ বললেন কী করবো দিদি সরকারি চাকরি করি, তাই এমতো অবস্থাতে সব দেখে শুনেও আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি। মনে কিছু করবেন না।

ট্রেন বঙ্গাইগাঁও স্টেশন ছেড়ে রাতের অন্ধকারে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে। যাত্রীরা সবাই কোনো প্রকারে সামান্য জায়গা করে নিয়েছে। কারও কোনো প্রকারের অভিযোগ নেই। আমাকে অতি কষ্টে বাচ্চা দুটেকে কোলে করেই রাত কাটাতে হলো। এমনি করে সকালবেলা আলিপুরদুয়ার স্টেশনে এসে পৌঁছে গেলাম। স্থানীয় লোকেরা যাত্রীদের সমবেদনা জানালেন। কেউ কেউ যাত্রীদের বললেন 'রাস্তায় আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

জানি না দুর্গতদের জন্যে ওদের মনে সত্যিকারের কী ব্যথা? ট্রেন কিন্তু ছাড়লো, পরদিন সকাল ন'টাতে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাল।

যাত্রীরা সবাই একে একে নেমে যেতে লাগলো। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। ট্রেনের কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকার দরুন সবাই নিজের মানুষ খুঁজে নিতে ভীষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল।

আমি আমার সঙ্গী ভাইটিকে বললাম দু'একজন কুলি ডেকে আনতে। আমি ছোটোবাবু ও খাবারের ব্যাগটা নিচ্ছি, তুমি আমার ছেলে-মেয়ে দুটিকে ভালো করে সামলাও, ওরা যেন এই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না যায়। এবার কুলির মাথায় মাল উঠিয়ে দিয়ে চললাম। জিনিস গেলে যাবে, ক্ষতি নেই কিন্তু আমার বাচ্চারা যাতে হারিয়ে না যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বুঝেছ তো এটা হলো হাওড়া স্টেশন। এখানে খুব সাবধানে চলতে হবে।

এদিকে আমাদের পাশে দু'জন টিকিট কালেক্টর দাঁড়িয়ে আমাদের কথাগুলো সবই শুনছিল। কাছে এসে বললো, 'আপনাদের টিকিট দেখান,' আমরা যে নতুন এবং বিশেষ চিন্তায় আছি সে বিষয়ে বুঝতে তাঁদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না। আর তারই ফায়দা লুটতে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে গেল। কুলিদের মাল ওঠাতে দিল না। দেখতে দেখতে স্টেশন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে বললো এই যে দিদি আপনি এভাবে যেতে পারবেন না। এই দুটো ট্রাঙ্ক আমাদের অফিসে নিয়ে যেতে হবে, দেখতে হবে এতে কী আছে। আমি বললাম কী আর থাকবে শাড়ি ও ব্যবহারিক কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আর বাচ্চাদের কাপড়চোপড়। তারা বলল, এ বললে তো হবে না, ভালো করে আমাদের দেখতে হবে।

বললাম, বেশ ঠিক আছে। চলুন কোথায় যেতে হবে। অনুরোধ করলাম, বাচ্চা আছে, এতদূর থেকে এসেছি— কত সময় লাগতে পারে বলুন। উত্তর এলো দু'চার ঘণ্টা তো লাগবেই। আমার চোখ মুহূর্তের মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেল। এদিকে অন্য একজন টিকিট কালেক্টর আমার ভাইটিকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল, আপনার দিদিকে বলুন আমাদের কিছু টাকা দিয়ে দিতে তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না। দিদির জন্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কী করবো বলুন সরকারি চাকরি করি, নিয়ম তো কিছু আমাদের মেনে চলতেই হবে। আমাদেরও আপনাদের এভাবে কষ্ট দিতে ভীষণ খারাপ লাগছে। দিদিকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।

বেচারা ভাই সহজ ও সরল মনে ধীরে ধীরে আমাকে বললো তাঁদের দুশো টাকা দিয়ে দিন আর চলুন। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, কেন? কী অপরাধে? দেরি হবে তাই তোমার ভয় করছে নাকি? একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুণি ওঁদের আসল চরিত্রটা ফাঁস করে দেবো। শুনতে পাচ্ছ না, অসমের যাত্রীদের জন্য ওঁদের কত দরদ! কত সহানুভূতি! আর কার্যক্ষেত্রে কী দেখতে পাচ্ছ, একবার ভেবে দেখ। এটাই হলো ওঁদের আসল চরিত্র। তুমি বাচ্চাদের নিয়ে জিনিসপত্রগুলো একটু লক্ষ্য রাখ। ওঁদের সঙ্গে কোনো কথা বা টাকাপয়সা নয়। আর এখান থেকে এক পাও নড়বে না। এবার আমাকে একটু আমার কাজ করতে দাও।

এই বলে আমার ডাইরি খুলে টিকিট কালেক্টার দু'জনের নাম-ধাম ও ফোন নম্বর সব লিখে দিয়ে আমি আমার কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, কোথায় যাচ্ছেন দিদি। আমরা আমাদের ডিউটি করছি। এখানে সেখানে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। শুধুমাত্র সময় বরবাদ করবেন। আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম দেখুন, আপনারা আপনাদের যা করণীয় ছিল করেছেন— এবার আমাকে আমার কাজ করতে দিন।

ব্যাপারটা সুবিধার নয় ভেবে তারা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। সঙ্গীকে বললো, দেখছিস না দিদি কেমন চটে গেছে। সত্যিই তো কত কষ্ট করে এসেছেন। তাছাড়া বাচ্চা নিয়ে উনি একটু নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

তিনি কুলিকে বললেন, 'এই মাল উঠাও আওর দিদিকে আরামসে টেক্সি স্টেন্ড পর লে যাও।' তারপর তিনি সঙ্গীটিকে বললেন, দেখ, সব জায়গাতে আমাদের অফিসের নিয়ম নীতি মেনে চলা যায় না, সময় বিশেষ কিছু কিছু বিষয় কনসিডার করতে হয়, বুঝেছ? আমার দিকে চেয়ে বললেন, এই ছেলেটা চাকরিতে নতুন জয়েন করেছে, তাই খুব বেশি নিয়ম মেনে চলতে চায়। শেষে বললেন, দিদি মনে কিছু করবেন না। নমস্কার!

এই হলো ভদ্রতার আড়ালে সভ্য মানুষের নগ্ন চরিত্র। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে চায়। সহানুভূতি শুধুমাত্র মুখে। □

সমর এয়ার ডিফেন্সের সফল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আরও শক্তিশালী হলো ভারতীয় বায়ুসেনা। এবার বায়ুসেনার হাতে এলো 'সমর' এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। ১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) সফলভাবে 'সমর' বায়ু প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার পরীক্ষা করেছে। আইএএফ তার পুরনো রাশিয়ান-অরিজিন এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম ব্যবহার করে সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল— 'সমর' মিসাইল সিস্টেম তৈরি করেছে। প্রথমবার মহড়ায় অংশগ্রহণ করে এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার অপারেশনাল ফিল্ড ট্রায়াল চলে। বায়ুসেনা জানিয়েছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা বিভিন্ন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গুলি চালানোর লক্ষ্য অর্জন করেছে। এর গতি অন্য দেশের কাছে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আইএএফ আধিকারিকরা বলেছেন যে 'সমর' সিস্টেমে একটি টুইন-টারেট রেল লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সিঙ্গল (একক) বা স্যালভো মোডে দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের ক্ষমতা রাখে। বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি.আর.চৌধুরী এবং ভাইস চিফ অব দ্য এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল এপি সিংহ এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞানবাপীর সমীক্ষা রিপোর্ট জমা পড়ল সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৮ ডিসেম্বর জ্ঞানবাপীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা রিপোর্ট জমা পড়ল সুপ্রিম কোর্টে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই) মুখবন্ধ করা খামে এই রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালতে। সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আগেই বাড়তি সময় চেয়ে নিয়েছিল এএসআই। সেই আবেদন মঞ্জুর করে বারাণসী আদালত। জ্ঞানবাপী মসজিদের অন্দরে হিন্দু নিদর্শন পাওয়ার পর আদালতের দ্বারস্থ হয় হিন্দুরা। মুসলিম পক্ষ পালটা আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতের নির্দেশে জ্ঞানবাপীর সমীক্ষার কাজ শুরু করেন এএসআই আধিকারিকরা। অবশেষে জমা পড়ল এই রিপোর্ট। হিন্দু ও মুসলমান পক্ষ মিলিয়ে সব আবেদনকারী সমীক্ষা রিপোর্টের প্রতিলিপি পাবেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে হিন্দু পক্ষের আইনজীবী মদনমোহন যাদব বলেন, 'বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট আদালতে জমা পড়েছে। আমরা চাই, এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক'।

রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত ৫০টি দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র বিশ্বের। সেই ধারণাকে মান্যতা দিয়ে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিদের রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। সনাতন ধর্ম বিশ্বাসীরা ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা ও আরব দেশগুলি-সহ ৫০টি দেশের প্রতিনিধিদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। শ্রীরামলালার অভিষেক অনুষ্ঠানে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এর জন্য ৫০টি দেশের সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও আমন্ত্রণপত্র প্রেরণের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। তিনি আর বলেন, 'রামমন্দিরের অনুষ্ঠানে দুবাই, সৌদি আরব ও অন্যান্য আরব দেশগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন। আমরা আশা করছি, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেন ছাড়াও আরও অনেক দেশের প্রতিনিধিরা রামমন্দিরের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন'।

ইতিমধ্যে ৭ হাজারেরও বেশি আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে ৩ হাজার ভিআইপি অতিথি রয়েছেন। পৃথকভাবে ধর্মগুরুদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। রামমন্দির আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী ৫০ জন করসেবকের পরিবারকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে একাধিক নিয়ম জারি করেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। যে সাধুসন্ত ও ধর্মগুরুরা অযোধ্যায় শ্রীরামলালার অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের পরিচয়পত্র হিসেবে নিজের আধার কার্ড দেখাতে হবে। উদ্বোধনী স্থানে মোবাইল, মানিব্যাগ ও পুজো দেওয়ার সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।